MADHU NIRJHOR

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED
MATERIAL

মধু নির্ঝর

গল্প সংকলন

*****

গার্গী ভট্টাচার্য

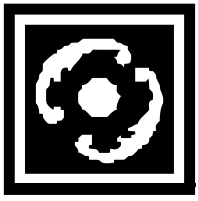

ছোট গল্প প্রেমীদের ----!!!

Somewhere around the place I've got an unfinished short story about Schrodinger's Dog; it was mostly moaning about all the attention the cat was getting. ~Terry Pratchett

মধু নির্ঝর

ছন্দসী

মেয়ে সোহাগের সাথে- তার মায়ের সম্পর্ক কেমন তাই নিয়ে মিডিয়া উত্তাল । সোহাগ হল তার সৎ মা, পরমার একমাত্র মেয়ে । পরমার নিজের দুই ছেলে আছে । লব আর কুশ । সোহাগের বাবা পলাশ কুন্ডু এখন দেশের সাইবার মন্ত্রী । ধন কুবের এই মানুষটির নিজস্ব ব্যবসা আছে অনেক । পাওয়ারের জন্য মন্ত্রী হয়েছেন । বয়স প্রায় ৬৫ । আগের পক্ষের মেয়ে সোহাগ । সেও এখন রাজনীতি করে । মন্ত্রী পলাশ

কুন্ডুর, বর্তমান স্ত্রী পরমাও রাজনীতিতে আসছে। পলাশের অবর্তমানে, এদের মধ্যে একজন তার গদিতে বসবে বলে। দুজনের বয়স কম । প্রথমা পত্নী মারা যাবার পরে, পলাশ কুন্ডু আবার বিয়ে করেন । তবে অনেকদিন পরে ।

অনেকে বলে- পরমা নাকি ফৈজাবাদের বিখ্যাত বাঈজী ফুলমণি । পলাশ ওকে পত্নীর মর্যাদা দিয়েছেন ।

মন্ত্রী মহাশয় কিন্তু কাজ করেন । লোকের সমর্থন পান তাই । জনগণ তাকে ভালোবাসে । একটু ক্ষ্যাপাটে ।

খুব টুইট করেন । টুইটে টুইটে টুইটাকার একেবারে।

বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বিশারদগণ বলে থাকে যে পরমা ও সোহাগের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে মনে হয় বা বোঝা যায় বেশ ; দুজনের মধ্যে সদ্ভাব নেই ।

হয়ত একে অপরের সাথে কর্কশ ভাবে ব্যবহার করে ।

পলাশ কুন্ডু মারা গেলে ; ওরা ঝামেলা পাকাবে কে গদিতে বসবে তাই নিয়ে ।সংবাদপত্রেও এরকম বার হয় । কিন্তু সময় এলে দেখা যায়- দুজনের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব রয়েছে । মা ও কন্যা হলেও ওরা আসলে বন্ধু ! পরমা

যেমন বড় হয়েছে, সেরকম সোহাগও অনেক ম্যাচিওর্ড এখন । তাই মিলন আরো সজীবভাবে দেখা যাচ্ছে ।

পন্ডিতরা দু:খিত, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ফেল করায় ।

সত্য হল ; পলাশ কুন্ডু মারা যাবার আগে ওদের কাউন্সেলিং করিয়ে, সুস্থ সম্পর্কে নিয়ে আসেন । কারণ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দুজনের মিলের কথা বলছে না পড়ে ও শুনে মন্ত্রী মহাশয় খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন । পরে ওদের ডেকে এনে- নিজের সম্মান রক্ষার্থে ওদের কাউন্সেলিং করার পরামর্শ দেন । তাই তারা আজ এইভাবে মিলেমিশে আছে ।

মুখে অবশ্য বলে যে ওরা নাকি অভিনয় করতো তখন । অর্থাৎ বডি ল্যাঙ্গুয়েজকে নকল ভাবে ফোটাতো । কিন্তু আসল কথা হল ওরা এখন অনেক পরিণত নারী । **ক্ষুদ্র স্বার্থের কারণে যারা দেশ ও দশকে বিপদে ফেলেনা ।**

নাবালক

সংকল্প ঘোষের হয়েছে মহাবিপদ ! আমেরিকায় কাজ করা এই যুবকের ঘাড়ে অনেক টাকার লোন অথচ ওকে হয়ত চাকরি ছাড়তে হবে ।

ভারত থেকে ; দুটো পাখনা লাগিয়ে উড়ে এসেছিলো রাজার দেশ স্টেটস্-এ । কিন্তু সম্প্রতি ওর বস্ হিসেবে আসছে রাজা পোদ্দার তাই ওকে হয়ত চাকরিটা ছেড়ে দিতে হবে । আবার নতুন চাকরি পাওয়া সহজ নয় এই বাজারে । আর বয়সও প্রায় ৫৫ হয়েছে । কী করে কী করবে ভাবতে শুরু করলে ওর স্ত্রী সুজাতা ওকে জিজ্ঞেস করে যে এক নতুন ম্যানেজার যে অনেক ডিগ্রীধারী ও শার্প মাইন্ডের মানুষ এবং সৎ লোক তাকে এত ভয় পাবার কী আছে আর সে যে ওকে বিপদে ফেলবে ম্যানেজার হয়ে এরকমই বা সে ভাবছে কেন ?

সব প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় বৌয়ের দিকে । বৌ ডিনার টেবিল সাজাচ্ছে । সবে সন্ধ্যে ছটা বাজছে । এখনই ওরা রাতের খাবার খেয়ে নেয় ।

পরে হাল্কা কিছু স্ন্যাক্স্ আর কফিপান করে শুতে যায় । বাচ্চারা এখন বেশ বড় তাই আলাদা শোয় । একজন অন্য বাসায় চলে গেছে ।

স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলে ওঠে সংকল্প ; সে এক লম্বা কাহিনী । কাহিনীর শুরু নাকতলায় আমার কাকার বাড়ি । কাকা প্রফেসরির সাথে সাথে বাসায় ছাত্র পড়াতেন । হাতযশ ছিলো বলে অনেক ছাত্র আসতো পড়তে । তার ভেতরে ছিলো রাজা পোদ্দার । প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তো বিজ্ঞান নিয়ে । যখন একেবারে ফাইনাল এম-এস-সি পরীক্ষা দেবে --তখন কাকার মেয়ে ঐন্দ্রিলা ; আমরা তো ওকে মিঠি বলেই ডাকি জানো তো , সেই মিঠি একটি চিঠি দেয় । প্রেম ভালোবাসা জানিয়ে । আসলে কিশোরী সে তখন । দেখতে মন্দ না । শ্যামলা বরণ , পুতুল পুতুল গড়ণ । আর গানের মতনই- কিছু বলতে গেলেই ফোঁস করে উঠতো --কাজেই বেশ সাহসী । সেই সময় মেয়েদের, প্রপোজ করার চল্ ছিলো না কলকাতায় । কাজেই রাজা পোদ্দার, কালোদের ঘৃণা করে বলেই বোধহয় মিঠির সাহসিকতা দেখে মোহিত না হয়ে নিজের মাকে নিয়ে এসে মিঠির বাবাকে খুব শাসিয়ে যায় । পোস্ট গ্র্যাজুয়েশান পড়ার সময় যে নাকি মায়ের সাথে নালিশের ডালি সাজিয়ে আসে, মাতৃভক্ত হনুমানের মতন সে কি আর মাত্র এই কয়েক বছরে এতটা ম্যাচিওর্ড হয়ে গেছে যে ম্যানেজারি করতে পারবে সফলভাবে? এই

ভেবে আমার সমস্যা হচ্ছে । মিঠি ছিলো এক বাচ্চা মেয়ে । তাকে ডেকে যা বলার বললেই হত । একবার না বলে দিলে মিঠি আর ওদিক মাড়াতো না । তবুও এই কান্ড করা দেখে সবাই অবাক হয় । আর রাজা পোদ্দার তো কালোদের ঘৃণা করে আর আমার গাত্রবর্ণ তো বেশ কালো । তাই হয়ত আমাকেও ফাঁসিয়ে দেবে কোনো কারণ ছাড়াই । লজিক ছাড়াই । বিশেষ করে যদি জানতে পারে যে আমি সেই মিঠিরই কাজিন !!!

মিঠি বাড়ি ছিলো না তখন । ক্লাস টেনের টেস্ট পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলো । সেদিনই ছিলো শেষ পরীক্ষা । মজায় ছিলো যে বাড়ি ফিরে প্রাণ ভরে গোজিকোর্ট আর কবাডি খেলতে পারবে বন্ধুদের সাথে । বদলে ; ফেরার পরে বাসায় এত মার খায় যে পিঠের ছাল চামড়া সব উঠে যায় । কাকার মারের জন্য ওকে নিয়ে ডাক্তারখানায় যেতে হয় এত ক্ষত হয়ে গিয়েছিলো ।

রাজা পোদ্দারের, পোদ্দারি করা মা বলে এসেছিলো যে -- প্রফেসর মশাই আপনার মেয়ের তো তলপেটে লাথি মেরে ওকে মেরে ফেলা উচিৎ !!

রাজা পোদ্দারের বৌয়ের ছবি দেখলাম, ফেসবুকে । নাকে নথ পরা, শুঁটকো-পণা এক মেয়ে, যার দাঁতগুলো এক

একটা রেললাইনের-- কাঠের পাটাতনের সাইজে । মনে হলনা যে অসম্ভব সুন্দরী অথবা চতুর ।

মিঠির চিঠি দেবার কারণে- আমাকে যদি রাজাসাহেব ছাঁটাই করে দেন কিংবা হ্যারাস করেন অযথা তখন আমার কাছে কোনো প্রমাণ থাকবে না, ওপরওয়ালাকে বলার জন্য । তাই আমি সাবধান হতে চাই । মিঠির মতন পিঠের ছালচামড়া ওঠার আগেই ।

কবর

দীর্ঘদিন ধরে তার মা-- সোনিয়া কে খুঁজে চলেছে ডায়না বিশ্বাস । এই উত্তর ভারতীয় মেয়েটি, তার মাকে বিদেশে নিয়ে আসে । ভদ্রমহিলা ওর সাথেই ছিলেন । রোজ সকালে মর্নিং-ওয়াকে যেতেন । একদিন আর ফেরেন না । বহু খোঁজাখুজি করেও তার সন্ধান পাওয়া যায়না । কেউ কিছুই জানেনা । সবাই ভেবে নেয় যে উনি হয়ত হারিয়ে গেছেন ।

বিনালং একটি ঘুমন্ত শহর । প্রবাসে, এই শহরে অনেক লেখক ও কবি অবসর কাটাতে যায় । শিল্পীরা যায় চিত্রিত করতে এর রূপ । পাহাড় ও বনে ঘেরা এই শহরে আগে সোনার খনি ছিলো । এখনও হয়ত খনিজ মানুষের বসবাসের কিছু কিছু ফাঁকা কটেজ আছে । পরিত্যক্ত হলেও সুন্দর । আকারে ছোট আর ইংলিশ স্থাপত্যের

এক একটি উদাহরণ । এই শহরে আরো আছে এক মোটর গাড়ি মিউজিয়াম । বহু পুরানো মোটর গাড়ির দেখা মেলে এখানে । আর আছে এক বিখ্যাত ডাকাতের কবর । বৃটিশ শাসনকালে, অনেক ডাকাত পালিয়ে গিয়ে বুশে মানে হাল্কা বনান্তে লুকিয়ে পড়তো । তারা সাহেবী নয় লোকাল খাবার খেয়েই সন্তুষ্ট হত । এদের মধ্যে অনেকেই যানবাহন ও ব্যাঙ্কে ডাকাতি করতো । এরকম এক দূর্ধর্ষ ডাকাত ছিলো ভিশে ডাকাত । পুরো নামঃ: ভার্গিজ ফিশে সংক্ষেপে ভিশে । আমাদের বিশে ডাকাতের মতন । সেই ডাকাতের কবর দেখতে নাকি বহুমানুষ আসে ।

একধরণের ভ্রমণের জায়গা আর কি !

ডায়নাও এসেছে খ্রীস্টমাসের সপ্তাহে । এই সময় অফিস থেকে জোর করে দু সপ্তাহের ছুটি দিয়ে দেয় ।

কাজ না করলে টাকা পায়না ডায়না ; কারণ সে কন্ট্রাক্টে কাজ করে । তাই ইচ্ছে নাহলেও ছুটি নিতেই হয় ।

এই বছর এসেছে বিনালং -এ । অনেক শুনেছে এর কথা । সবুজ, সতেজ বনে ঘেরা আধাশহর । মনে হয় সবসময় ঘুমাচ্ছে । ওরা মজা করে বলে : এখানে লং কাজ বা অন্যকিছু লম্বা নিয়ে আসা যাবেনা । এতই স্লিপি টাউন । এর নামেই তা খোদিত আছে ; বিনালং ।

একদিন বিকেলে, সূর্য ডোবার একটু আগেই একটা চাতালে গিয়ে বিশ্রাম নিতে বসে ডায়না । ওর বর তখন এগিয়ে গেছে । হঠাৎ খেয়াল হল যে চাতালটি একটি নীচু গোছের কবর আর সেখানে ফলকের বদলে চাতালে নাম লেখা । লেখা রয়েছে সোনিয়া মন্ডল , বর্ণ ১৯৪৫, ইন্ডিয়া ।

এতো ওর মায়ের কবর মনে হচ্ছে । ভীষণ ঘাবড়ে যায় ডায়না । ছুটতে গিয়ে পড়েও যায় । জোরে জোরে নি:শ্বাস নিতে নিতে, ওর বর তুফানকে ডাকে । তারপর বার হয় যে মা এই গ্রামেই এসে মারা যান । মায়ের নাকি কলকাতাতেই ক্যান্সার ধরা পড়ে । লুকিয়ে রেখেছিলেন ডায়নার কাছে । কারণ সে জানতে পারলে খুব ভেঙে পড়বে । একা মা কলকাতায় আছেন । কেই বা ক্যান্সার হাসপাতালে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করবে ? ছুটি নিয়ে মেয়েটা কতদিনই বা থাকবে কলকাতায় ? তাই মা, ওর ডাকে সাড়া দিয়েই বিদেশে আসেন কিন্তু রোগ সামলাতে না পেরে- বাড়ি থেকে উধাও হয়ে বিনালং এ আসেন, এক মর্নিং ওয়াকের বন্ধুর পৈত্রিক বাসায় । মারা যাবার আগে হস্পিসে ছিলেন । সরকার পক্ষ থেকে সব দেখেছে ।

এইদেশে রুগী না চাইলে তার চিকিৎসা হয়না তা যতবড় অসুখই হোক্ না কেন । আর রুগীকেই প্রাধান্য দেওয়া

হয় আর কাউকে নয় ; সোনিয়া চায়নি ওর মেয়ে জামাই খবর পাক-- তাই কেউ ওদের জানায়নি ।

হাপুস নয়নে কেঁদে চলে ডায়না । মাতৃশোকে শুধু নয় মায়ের এই আত্মত্যাগের কারণে । আজকাল তো প্রায়-অনেকেই বুড়ো বাপ্-মাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, অথচ ডায়নার মাকে দেখো !

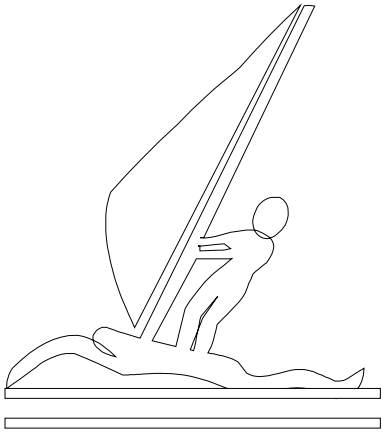

গুহা

গুহায় থাকে নেতা পরমব্রত । পরমব্রতর ব্যাক্তিগত সম্পত্তি নেই কোনো । মুম্বাইয়ের কাছে এক পাহাড়ি গুহায়, আগে যেখানে বীর মারাঠা রাজারা কেল্লা বানিয়ে থাকতো- সেরকম এক ভগ্ন-কেল্লার কাছে এক প্রাকৃতিক গুহায় বাস করে পরমব্রত । রোজ কাজ সেরে সরকারি গাড়িতে গুহায় যায় । সেখানে কেউ না কেউ তার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে রাখে । অনেকে ওকে না খাইয়ে নিজে খায়না । এক দেহপসারিনী তো ওকে সবার আগে খাবার দিয়ে যায় । তার সম্পর্কে নেতা -পরমব্রত বলে যে ও হয়ত কাজ সেরকম কিছু করছে না এই জন্মে কিন্তু ওর মনটা খুব বড় ।

অন্যান্য দেশের মানুষ তাকে দেখার জন্য পাগল । কে এমন নেতা এই ভারতে যার কোনো পুঁজি নেই , ঘর নেই আর একেবারে গুহায় বাস করে !

আসলে পরমব্রতর বক্তব্য হল এই যে সে সর্বশ্রেনীর মানুষের নেতা আর কাজও করে সবার মঙ্গলার্থে । তাই ফুড , শেল্টার আর ক্লোদিং এর কোনো অসুবিধে হয়না তার । মানুষই , ভালোবেসে ওকে দান করে । আর ও তো আসলে জনসাধারণের চাকর । তাই ওদের কাছ থেকে এইসব নিতে ওর বিন্দুমাত্র লজ্জা করেনা । বদলে ওদের জন্য প্রচুর খাটে ও নানান পলিসি বানায়, যাতে সবার সমানভাবে নাহলেও কিছু না কিছু উপকার হয় । **ওর কাজ মানুষকে পথ দেখানো, ওদের জীবনে আলো জ্বালানো আর ও সেই কাজটি খুব দায়িত্বের সঙ্গে ও মন দিয়েই করছে । তাই এই এগিয়ে যাওয়া শতাব্দীতে ; গুহা-মানব হলেও- খাওয়া পরার আর কোনো চিন্তা নেই ওর ।**

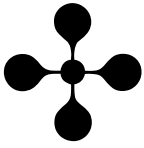

কোরো

পড়শী, মিসেস কাউন্টি আজকাল আর কাজ করে না । মহিলা ; সুদূর মালেশিয়া থেকে আসে । অনেক কষ্ট করে নিজের পায়ে দাঁড়ায় আর বিয়ে করে এক সাহেব ইলেকট্রিক মিস্ত্রীকে । দুজনের ভারি ভাব । কিন্তু কোনো সন্তান নেই । মহিলা সারাটা দিন একা থাকে ; বাসায় । ওর স্বামী কাকভোরে কাজে বেরিয়ে যায় । দিনের বেলায়, উজ্জ্বল রং এর পোশাক পরে , মাথার চুল গোলাপী অথব কমলা রং এ রাঙিয়ে- জ্যাকি কাউন্টি আসল নাম সেলেনা ; কুকুরকে নিয়ে ঘুরতে বের হয় ।

কুকুরকে নাকি খেতে দেয়না । কোন এক পড়শী কুকুরের ডাক্তার- সে নাকি কুকুরের চেহারা দেখেই আন্দাজ করেছে যে সে খেতে পায়না । হাড়পাঁজরা বার হয়েছে , কুকুর অগাস্টিনের । মহিলার কাঁচের দরজা ও জানালায় শাটার লাগানো । কুকুরকে কখনো একা বাইরে খেলতে দেখা যায়না । সে সবসময় নাকি ঘরে থাকে । কাউকে ঘরে ঢোকায় না ওরা ।

কেউ ওদের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে গেলে বাগানে বসে । ছাতার তলায় । দুজন মানুষের মোট চারটে গাড়ি । দুটো গ্যারেজে থাকে আর দুটো, ঘর বানিয়ে সেখানে রেখেছে । এমন কি ময়লা ফেলার বিনও ঘরে থাকে ওদের । কেন এমনধারা ব্যবস্থা- জানতে আগ্রহী ভারতের মেয়ে দীপিকা কেশভন্ ; দারস্থ হয়- উল্টোদিকের ২০বছর ধরে এই পাড়ায় থাকা সবচেয়ে পুরোনো এক অ্যাফ্রিকান দম্পতির ।

কিথ্ আর স্টেফানি অনেকদিন ধরেই এই পাড়ায় । তখন সরকার নতুন নতুন বাড়ি করে, লোককে বিক্রী করছে-- কম দামে । স্টেফানিরা যখন এখানে বাড়ি কেনে তখন নাকি কেউ এইসব দিকে আসতো না । রেসিজ্ম্ আর চুরির ভয়ে । এখানে নাকি একটু নিচু ক্লাসের সব অল্প-শিক্ষিত লোকেরা থাকে তাই রেসিজম্ ভালই হতো । তবে এখন অনেক বদলে গেছে সব ।

জানা যায়, জ্যাকি নাকি **কোরো** নামক এক ব্যাধির শিকার । এই মানসিক ব্যাধিতে লোকে নাকি মনে করে যে তাদের যৌন-অঙ্গ নেই । হারিয়ে গেছে । কিন্তু ওটাই অসুখ । আসলে এমন যে হয়না সেটা লজিক্যালি বোঝে জ্যাকি । তাই সবকিছু লুকিয়ে রাখে যাতে কেউ টের না পায় কোনোভাবে যে ওর এই ব্যামো আছে । বিনে

যদি এমন কিছু ফেলে যা লোকে দেখে ফেলে কিংবা ঘরে ঢুকে লোকে যদি কিছু আঁচ করে অথবা কুকুর ওর কোলে উঠতে চাইলে ওর ভয় হয় যে শুঁকে বলে দেবে ওর সেক্স অর্গ্যান নেই আর কেউ যদি তা দেখে ফেলে সেই ভয়ে সব লুকিয়ে রাখে । চাকরি ছেড়েছে এই কারণে । কাজে মন বসেনা । সবসময় যৌনাঙ্গ সামলাতে ব্যস্ত ।

লোককে অবশ্যি বলে যে অনেক কাজ করেছে ,এখন সুপার অ্যানুয়েশানটা ভোগ করতে আগ্রহী তাই কাজ করেনা । আর সন্তানও নেই । স্বামী কাজে আছে । কিন্তু ওর বর মিস্টার কাউন্টি, কমিউনিটিতে বলে রেখেছেন যে ওর এরকম লজিকবিহীন কোনো কাজ দেখলে যেন কেউ কিছু না মনে করে কারণ সে অসুস্থ । **কাগুজে বাঘের হাতে, যৌন অঙ্গ হারানোর কাল্পনিক শোকে মাতাল ।**

ঐতিহ্য

কলাগড়ের জমিদার বাড়ির মানুষ খুব ঐতিহ্য মেনে চলে । ওদের বাসায় সবই প্রাচীন জিনিসের তৈরি আর ওরা মুক্ত জগতের বিপরীতে । মেয়েরা আজও ঘরের বাইরে গেলে মুখ ঢেকে যায় ঘোমটা দিয়ে ।

ঘোড়ার গাড়ি চলে । মোটর নেই । সুরাপান আর শহরের বাঈজী নাচানোর ঐতিহ্য আজও মানা হয় ।

মেয়েরা বেশি লেখাপড়া করেনা । মোটা গহনা পরে । সবাই শাড়ি পরিহিতা , আধুনিক কোনো পোশাক দেখা যায়না । পুরুষেরাও ধুতি পরে । ভালই লাগে দেখতে । তবে ওদের পাঞ্জাবির কাজ করে, নিজেদের দর্জি । বাজারের কেউ না । ওদের ঘরে একটিও জেনেটিক্যালি মডিফায়েড সবজি নেই । নেই রসায়নে চোবানো সাবান কিংবা পানীয় । ওদের মধ্যে পন্ডিতদের, আকাশে বৃষ্টি দেখলে মনে হয় সিলভার আয়োডাইড বম্বিং । জ্যান্ত নয় মৃত ; শহুরে মাছকে সজীব লাগে ফর্মালিনের জন্য

আর মেয়েদের এত যে সৌন্দর্য্য, তা সবই নাকি প্লাস্টিক সার্জারির কল্যাণে ।

মূলতঃ কলার বাগান দেখাশোনা করা এই জমিদার বংশে বিয়ে হয়ে আসে কলকাতার মেয়ে দোলা । দোলা আন্তর্জালে, এই বাড়ির এক ছেলের সন্ধান পায় । ছেলেটিকে কিছুতেই তার বাড়ির লোক, বাইরে উচ্চশিক্ষা নিতে যেতে দেবেনা ।

সে বায়োলজি নিয়ে পড়েছে লোকাল কলেজে । এবার বাইরে যেতে চায়-- পোস্ট গ্র্যাজুয়েশান করতে । কিন্তু বাড়ির লোকের মত নেই । সে বসে বসে ,মোবাইলে ইন্টার্নেট করে ।

দোলাকে অবশ্যি খুবই পছন্দ হয়েছে সবার । বিয়ে করেই ওকে ঘরে এনেছে ওর বর- তাই ওকে ফেলে দেবার চেষ্টা কেউ করেনি কিন্তু ওকে বলেছে যে ওদের মতন করে তাকে থাকতে হবে ।

এদিকে দোলা, অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে । ওকে দেখতেও ভালো আর মনটাও ভালো । তাই সবার প্রিয় হয়ে উঠেছে । দোলা সাজতেও জানে । ওদের মতন হবে বলে সেন্ট না লাগিয়ে জুঁই , বেল, চাঁপা ফুল বা গোলাপের আতর ব্যবহার করে । ধূপের ধোঁয়ায় চুল শুকায় । ভেষজ ঔষধ খায়, অসুখ বিসুখে ।

কিন্তু নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে ; পতির সংসারে ঠাঁই পাওয়া এই মেয়েটির- একদিন আইনতঃ বিচ্ছেদ হয়ে যায় । **বংশের প্রথম ডাইভোর্স দেখতে, গোটা পরিবার কোর্টে জমা হয় । সেই ঘোড়ায় টানা কোচে করেই !**

কেন হল এই বিচ্ছেদ ? সব তো সুন্দরভাবেই চলছিলো- তাহলে ? মুক্ত মেয়ের ; মুক্ত মনে কী এমন কালো দাগ ফুটে উঠলো ?

আসলে ঐতিহ্য বহন করতে করতে অসুস্থ, দোলা । সবথেকে সমস্যা হয় টয়লেট নিয়ে । না ওকে ওরা টিস্যু পেপার ব্যবহার করতে দেয় ; না জল । টিস্যু পেপার রসায়নে ভরা আর জল মানে ডাইরেক্ট হাত ব্যবহার , জল দিয়ে এতসব হয়না । ছড়িয়ে পড়ে । তাই ওরা পাথর ব্যবহার করে নিজেদের ক্লিন করতে ।

অনেক চেষ্টা করেছিলো দোলা যদি থেকে যেতে পারে সব মানিয়ে ! কিন্তু সম্ভব হলনা । পাথরের পর পাথর এসে ; ওকে একটি কেল্লা বানিয়ে ফেললো । দু:খের কেল্লা । তাই শেষমেশ ছাড়াছাড়ি হয়েই গেলো ।

হাতুড়ি দিয়ে কি আর পুষ্পমালা গাঁথা যায় ?

তা সে যতই ঐতিহ্য বহন করুক না কেন !!!

বনলতা

নীরমহল ; একটি অরণ্য প্রান্তর যার দুই দিকে দুটি রাজ্য । জমিরা আর কোয়েশী । এই দুই রাজ্যের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে একটি বড় নদী । এই নদীর নাম বিন্দুকুশ । বিন্দুকুশের জল দিয়েই দুই রাজ্যের জলীয় সমস্যা মেটানো হয় । সরকার তাই একটি বাঁধ তৈরি করেছে এই নদীর ওপরে । সেই বা ঁধের জন্য দুই রাজ্যেরই সমানভাবে জল পাওয়ার কথা কিন্তু বাস্তবে যেদিকে বাঁধের কলকব্জা ; সেই রাজ্য প্রায়ই জল কমিয়ে দেয় নানান ছুঁতোনাতায়- অন্য রাজ্যের । আর ড্যাম বানানোর সময় অনেক চাষীর জমি সরকার নিয়ে নেয় । তারা এখন বনে বাস করে । পশু মেরে , বনবিভাগে দরোয়ানি করে কিংবা বনজ মধু বিক্রি করে খায় । অনেক মানুষ সেই সময় সুইসাইড করেছিলো । যারা সাহস করে বেঁচে ছিলো তারাই এখন বনকে আঁকড়ে বেঁচে আছে । এরকমই এক বুড়ো সুরাই ।

তার মেয়ে, কুহুকে নিয়ে থাকে বনের পাশে । চালায় এক দোকান যেখানে পর্যটকরা খাবার খেতে পারে । ছোট দোকান । ভেতরে দুটি ঘর । একটি রান্নাঘর, অন্যটি খাবার ।

সেখানে মদ ও মেয়েমানুষের ব্যবস্থাও আছে , প্রয়োজন হলে । অনেক ট্যুরিস্ট বলে, বনফুল আর বনলতা ।

মেয়েটি দোকান চালায়, ওর বাপ্ বিড়ি টানে আর খদ্দেরদের নিয়ে আসে । আজকাল ম্যাগি, চিপ্স্ আর কোল্ড ড্রিংক্সও পাওয়া যায় । তবে জমিরা রাজ্য থেকে এলে, বিশেষ সুবিধে কি? খাবারও মেলেনা । কারণ ঐ জল নিয়ে গোলমাল । গোলমাল এতটাই হয় যে প্রায় প্রতিবছরই সেটা হাতাহাতিতে গিয়ে শেষ হয় ।

এই দোকানের সামনে- একদিন এক পুরুষকে নগ্ন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় , কাঁধে এক ব্যাগ । লোকটি মধ্যবয়সী । ব্যাগ ঘেঁটে- মেলে জমিরা দেশ মানে রাজ্যের কার্ড । চেহারায়, বিশেষ পার্থক্য নেই জমিরা ও কোয়েশী রাজ্যবাসীদের ।কাজেই দেখে বোঝার উপায় নেই । যথাসময় লোকটির চিকিৎসা হয় কিন্তু স্থানীয় ডাক্তার বলে যে ওর কোনো মানসিক

আঘাতের জন্য এই হাল । দৈহিক কোনো ব্যামো দেখা যাচ্ছে না । প্রেসার ফেসার , রক্ত পরীক্ষা সবই নর্মাল । ওর আসলে মায়া মমতার প্রয়োজন । মায়া পেলে সেরে উঠবে নাহলে একদমই হারিয়ে যাবে বিষাদ জগতে ।

দায়িত্ব নিলো কুহু । কালো কুচকুচে মেয়ে । চোখ নাক দেখা যায়না । রূপার দুটি দুল পরা । মেটে রং এর টিপ্ আর এক পায়ে , পায়েল ।

দোকানের কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে সারিয়ে তোলে লোকটিকে । বিবাহিত মানুষ , পত্নীর সাথে বনিবনা নেই । সে একমাত্র সন্তানকে নিয়ে চলে গেছে ।

লোকটি পেশায় অধ্যাপক । নিয়মিত এক কলগার্লের কাছে যেতো । কিন্তু ওসব জায়গায় তো স্থায়ী সমাধান মেলেনা । কাজেই ক্রমশ নুইয়ে পড়ে । উদ্দেশ্যহীন ভাবে জঙ্গলে ঘোরার সময় শত্রু রাজ্যে ঢুকে পড়ে ।

লোকটির বিয়ে হয়ে গেছে শুনে কুহুকে ওর দোকানের বন্ধুরা বলে :: তোর তো কোনো লাভই হলনা রে ! এত সেবাযত্ন করে ভালো করলি শত্রুকে !

কুহু ; কালো মুখে সাদা দন্তসারি বার করে , মিষ্টি হেসে বলে ওঠে ::: আমি একজন অসুস্থ মানুষের সেবা করেছি । কোনো স্বার্থে নয় । আর কে শত্রু , কে মিত্র আমি জানিনা । মানুষ একা বাঁচতে পারেনা । তার অন্য মানুষকে দরকার হয় । এই মানুষটির, আমাকে দরকার ছিলো । আমি মানুষের ধর্ম পালন করেছি । এই আর কি ।

মানুষটি কিন্তু আর শহরে ফেরেনা । নিজের নাম বদলে করে ফেলে সেতু । বলে ::: ওপাড়ে আমার কেউ নেই, কিছু নেই । এখানে দুই বন্ধু আছে । কুহু ও তার বাপ্ - সুরাই । নির্জন জায়গায় ফিরে না গিয়ে এখানে থাকাই ভালো ।

লোকটি, বটানির প্রফেসর ছিলো তাই এখন সারাদিন বনে বনে ঘুরে গাছ খোঁজে আর দেখে । সকাল ও সন্ধ্যায় কুহুর দোকানে ফ্রিতে খায় ।কুহুর, চলার পথে

ও নাকি এক মশাল আর ওর কাছে কুহু ও বাপ্ হল পরম মিত্র । ওর কেউ না থাকলেও এরা আছে ।

কুহু যতদিন বেঁচে আছে, এই ছ্যারের (স্যার) খাওয়ার অসুবিধে হবেনা । এরকমই বলে ; কৈশোরে- সর্প দংশনে স্বামী হারানো কুহু । ওর স্বামীই আসলে ওর নাম কুহু দেয় । আগে ওর নাম ছিলো রিমিল্ ।

কুহু দেয়- ওর ডাকে মিঠাস্ আছে বলে ।

তিন ভুবন

কেপি- আমার সহপাঠী । গ্রাম থেকে শহরে পড়তে আসা মেধাবী ছেলেটি, আগে একদম গ্রাম্য ছিলো । লম্বা ছাতা , মোটা চশমা আর আদ্দিকেলে পোশাকে ওকে ক্লাউনের মতন লাগতো । কয়েকবার কলেজে ঢোকার সময়, হাই-ড্রেন পার হতে গিয়ে জলে পড়েও গিয়েছিলো । লোকে খুব হাসি-ঠাট্টা করতো এসবের জন্য -ওকে নিয়ে ।

আমার ওকে ভালই লাগতো । একবার ওর কবিতা দেশ-পত্রিকায় বার হয় । সেদিন **বন্ধু** ছিলো বলে অনেকটা পথ হেঁটে আসে আমার বাসায় ; আমাকে পড়ানোর জন্য ।

ক্লাসের মেয়ে প্রমিতাকে ও ভালোবাসতো । প্রমিতা অবশ্য ওর থেকে নোট্স্ নিতো- তাই ওকে বাড়ি নিয়ে যেতো কিন্তু প্রেমে পড়েনি এরকম মানুষের । আমাদের বলতো :: একটা গাঁইয়াকে তো আমি বিয়ে করতে পারিনা !!

আমি কয়েকবার কেপিকে হিন্টস্ দিয়েছি । তবুও ও প্রমিতার জীবন থেকে সরেনি । বলতো :: প্রমিতা যাই ভাবুক, আমার ভালোলাগে ওর সঙ্গ তাই আমি মিশি ।

কেপির পুরো নাম কুষণ পুরকায়স্থ । বাবা গ্রামীণ স্কুলের টিচার । মা- রেলে কাজ করে । মহিলা টিটি । টিকিট চেকার ।

কুষণের বাবা ভূষণ, খুব ভালো হাত দেখতো । জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কে তার অশেষ জ্ঞান ।

তাই বোধহয় কুষণ কলেজ শেষ করে, শহরে একটি অ্যাস্ট্রোলজির দোকান খুলে বসে । বাবার কাছে

হাতেখড়ি , পরে প্রফেশন্যাল ট্রেনিং নিয়ে নেয় । যার হবার কথা ছিলো প্রযুক্তিবিদ্- সে কিনা হল জ্যোতিষী । গ্রাম থেকে শহরে এসে বদলে ফেললো নিজেকে ।

কলেজের ছাত্র উপচে পড়তো পরীক্ষার আগে-- আর শিক্ষকরাও নাকি অনেকে আসতো । অংকের প্রফেসর জ্ঞান-শাস্ত্রী, যিনি পিওর ম্যাথেমেটিক্সের মানুষ তিনিও ওর কাছে এসে অ্যাস্ট্রোলজি শিখতেন ।

এসব কাগুজে ভাগ্যগণনা আর এই সপ্তাহ কেমন যাবে এগুলি নাকি হল গাঁজাখুড়ি । ভাগ্য গণনা করা এত সহজ নয় । অনেক সময় কার্মিক ফোর্স , ডিভাইন ফোর্সের দৌলতে- অনেক অংশে কম হানিকর হয়ে যায় । তাই বেস্ট হল ঈশরের কাছে গিয়ে সারেন্ডার করা । **এসব বলতো প্রমিতার প্রিয়দর্শী ।** প্রমিতা ওকে বিয়ে না করলেও- নোটস্ এর জন্য এসব নামে ডাকতো ।

অনেক পরে --নিজের ছক্ দেখে নাকি কুষণ সব ছেড়ে ছুড়ে একটি মফ:স্বলে চলে যায় । কারণ শহরে থাকলে তার বড় বিপদ হবার সম্ভবনা ছিলো ।

আমি ওকে সেখানেই আবার দেখি । নাম কুঞ্জবিহারিপুর । সেখানে কুষণ ; নীলম্ পাহাড়ের একটি জনপদে

আছে । শহর থেকে দূরে । ওখানে ডোডা ট্রাইব্সদের হাতে বানানো , মিরি নামের একটি বিশেষ শালের কাজ শিখছে । ঠিক শাল নয় কাঁথা অথবা চাদর বলাও যেতে পারে । সাদা কাপড়ে লাল, নীল আর হলুদ সুতো দিয়ে এমনই কাজ যে মনে হবে উল বোনা হয়েছে । সবই জ্যামিতিক আকারে বানানো অথবা চাঁদ, সূর্য আর পশু । তবুও মনোরম । এই তিন রঙা চাদর ওরা উপহার দেয় লোককে । নিজেরাও পরে উৎসবে আর বিয়ে ইত্যাদির সময় ।

কুষণ এখানে বেশ রসেবশে আছে । প্রমিতার তো বিয়ে হয়ে গেছে তাই কুষণ এখন একা । এই এলাকায় একটি মেয়ে আছে সুতোর কাজ করে, মিরি তৈরি করে । নাম তার অ্যাঞ্জেলি । অ্যাঞ্জি সংক্ষেপে । তাকেই নিয়ে আছে বেশ । নাকি আর মহাদশা কাটলেও শহরে ফিরছে না । প্রমিতা ভ্যানিশ, অ্যাঞ্জি স্টেজে নেমেছে এখন ।

তিন ভুবনের পাড়ে দাঁড়িয়ে , আমিই একমাত্র লোক যে কুষণের জীবনের এই তিন অধ্যায়ের সাক্ষী ; যাকে বলা চলে ওর তিন ভুবন ।

গ্রামীণ, সবুজ অন্ধকার থেকে লন্ঠন প্রমিতা থেকে জ্যোতিষী থেকে মিরি সুতোর কাজ থেকে অ্যাঞ্জি -----

বয়ে চলেছে দুর্বার নদীর মতন কুষণ বা কিষণের আপাতদৃষ্টিতে সরল , সহজ জীবন ।

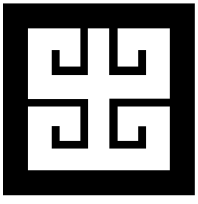

নিখোঁজ

অড্রে ব্রাউনের কথা শুনি আমি তার স্বামী নীল ব্রাউনের কাছেই । আমি একটি ছোট শহরে চশমার দোকানে কাজ করতাম । আমার স্বামী অন্য দেশে কাজে গিয়েছিলো । সেই সময় আমি নীলের সাথে সময় কাটাতাম বন্ধু হিসেবে । অনেক ভারতীয় খাবার তৈরি করে ওকে দিয়েছি । খুব খুশি হতো । বলতো :: আমার তো বৌ নেই ! তোমার দৌলতে অনেক ভালোমন্দ খেতে পারছি ।

নীলের স্ত্রী , অড্রে আমাদের শহরের কুখ্যাত সাইক্লোন --মার্থার প্রকোপে নিখোঁজ । অনেক বছর তার কোনো খবর পাওয়া যায়নি । সরকার পক্ষ অথবা ব্যাক্তিগত প্রচেষ্টা কোনোটাতেই কোনো সুবিধে হয়নি

। আমি অজন্তা মল্লিক , ইদানিং নীলের এক পরম বন্ধু ও শুভাকাঙখী হয়ে উঠেছি ।

এই ঘটনার বছর খানেক পরে আমি নীলের বন্ধু থাকা অবস্থায় ; চশমার কাজ ছেড়ে একটি ক্ষুদ্র জনপদে কাজ নিয়ে যাই । সেখানে একটি আদিবাসী শিক্ষা সংস্থায় আমি শিক্ষক । ট্রেনিং হয়েছে -এবার কাজের পালা ।

ওখানেই আলাপ হয় অড্রে ব্রাউনের সাথে । নাম বদলে করে ফেলেছে লিজা গাস্কোহেন । ওর বিয়ের আগের পদবী আর নতুন নাম ।

চেহারা দেখে সন্দেহ হয় আর পরে ঘনিষ্ঠতা হলে জানতে পারি যে সেই আসল অড্রে ।

ভদ্রমহিলা ইচ্ছে করে লুকিয়ে আছেন । স্বামীর দেওয়া বিজ্ঞাপন দেখেছেন টিভিতে আর পেপারে । তবুও ফিরে যাননি আর যাবেন বলেও মনে হয়না ।

অনেক কষ্ট ওর বুকে ! তীর বিঁধে আছে একটা । বিষাক্ত তীর । ভদ্রমহিলা নাকছাবি পরেন । এখন বিদেশিনীরা, আমাদের এশিয়ার মানুষের সাথে মিশে

মিশে অনেক গয়না পরতে শুরু করেছে । পায়েল, চুড়ি, নথ, কোমড় বন্ধ , টায়রা , টিক্‌লি ইত্যাদি ।

ওর নাকছাবিটা মনে হল চুণীর । লাল টক্‌টক্‌ করছে । হীরা নাকি ওর অসহ্য । কোনো রং নেই । সাদা একেবারে । ওর নাকি রঙীন গোধূলি পছন্দ ।

ঝড় -বৃষ্টি একদম ভালোবাসেন না । তবুও তার জীবনে ঝড়ের সংখ্যা অনেক । এক ঝড়ে গৃহহীন হয়েছেন । তাতে তেমন দু:খ নাহলেও অন্যান্য ঝড়ের গল্পও শুনলাম যা যথেষ্ট দু:খের ।

আজ তার স্বামী তাকে এত মিস্‌ করছেন- অথচ এমন দিনও গেছে যখন তার দুটি চোখ নষ্ট হতে চলেছিলো । সেই সময় তার স্বামী তাকে একবিন্দুও সাহায্য করেননি । একটা চোখে এখন দেখেন না । অন্যটাও খুইয়েছেন কিন্তু সেই চোখ দান করেছেন ওর সৎ শাশুড়ি । নীল ব্রাউনের সৎমা ; শার্লট ব্রাউন !

সেইসময় -যখন স্ত্রী-র অন্ধত্ব নিয়ে ভুবন মাতাল তখন একটা চোখ দান করার কষ্ট ও অসুবিধে মনে করে দূরে সরে গেছে নীল । অনেক দূরে । মানসিক ভাবে । তাই আজ লুকিয়ে আছে অড্রে । বলে :: ফিরে গিয়ে কী হবে ? ঐ মানুষটার কাছে আমি এক বোঝা আসলে । হয়ত লোকলজ্জার ভয়ে বা কাজ করার

কুড়েমির জন্য আমাকে ফেরৎ চায় । আসলে ও আমাকে পছন্দ করেনা ।

আমি সব শুনে প্রশ্ন করি :: চোখ দুটি, এত কম বয়সে খারাপ হল কী করে ?

শুনে গম্ভীর হয়ে যান অদ্রে । তারপর বলেন :: তার জন্যেও নীল দায়ী । আমাকে জোর করে চোখের সার্জারি করায় । কসমেটিক্ সার্জারি । আমার চোখ দুটি একটু ক্ষুদে ছিলো আর মণিটা নীল ছিলো না বরং ধূসর ছিলো । তাই ও সেই চোখকে একদম পার্ফেক্ট করতে অপারেশান করায় । তাতেই এই অবস্থা । চিকিৎসকও ওকে বারণ করেছিলো, অযথা ন্যাচেরাল জিনিস নিয়ে ঘাঁটাঘাটি না করতে- যেখানে সেই অর্গ্যান অসুস্থ নয় বা কোনো অসুবিধে করছে না- সেখানে । নীল শোনেনি । ও শোনার বান্দা নয় ।ওর খুব ইগো আর অসম্ভব ক্রেজিও । তা তোমার সাথে ওর এত বন্ধুত্ব হল কী করে ? তুমি তো দেখছি বেশ খাটো আর মলিন তোমার দুই চোখ ।

নীলের লজিক হল, মেয়েদের সুন্দর না হয়ে পথেঘাটে বেরোতে নেই । মেয়েরা হবে পরীদের মতন । কেকের মতন নরম ও সুন্দর , রঙীন ।

অড্রে আরো বলেন যে নীলের ভুবন ; রং মশালের আলোয় ভরা । আর অড্রের ভালোলাগে সাদাকালো ।

দৃষ্টিকোণ , চিন্তাধারা আর পছন্দ একেবারে ভিন্ন দুজনের । এখন বয়স হয়েছে বলে নীল কেবল আনন্দ ফূর্তি করে , গলফ্ ও টেনিস খেলে আর মেয়েদের ফাক্ করে সময় কাটায় । বিয়ের আগে ফাক্ করেছে বৌ হয়নি বলে, বিয়ের পরে একঘেয়ে লেগেছে বলে করেছে আর এখন বৌ হারিয়ে গেছে বলেও অনেক মেয়েদের ফাক্ করছে । সে আলোর পোকা আর মৌমাছি ; অড্রে নাকি মথের মতন । শান্ত । অড্রের সমাজের কাজ করতে ভালোলাগে । পড়েছেন সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে ।

বলেন :::: জানো, এখানেও লোকে বৌ পেটায় খুব । কিন্তু কেউ মুখে খোলেনা সহজে । তাই বাইরে আসেনা ।

আমাদের দুজনের কাজ আদিবাসীদের নিয়ে- বলেই হয়ত বললেন যে উনি এখন আদিবাসীদের মধ্যে যারা মা হবার পরে কাজ খোঁজে বা চাকরি থেকে অনেকদিন ছুটি নিয়ে, মা হয় আর পরে অন্য পেশায় ঢুকতে চায় তাদের উনি ট্রেনিং দেন -নানান বিষয়ে যা বাজারে কাজের খোঁজ করতে সাহায্য করে । এই প্রজেক্ট সরকারের তাই আমি আর অড্রে একই ফিল্ডে আছি ।

আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে আমি যেন নীলকে এসব না জানাই । উনি যে লুকিয়ে আছেন সেটা জানতে পারলে, নীল ওনার ঘাড় ধরে ওনাকে নিয়েই যাবেন । তাগরাই চেহারার নীল, যিনি নাকি সময় কাটাতেন যত্তসব ডেন্‌জারাস্ স্পোর্টস্ খেলে ; তাতেই নাকি ওনার অ্যাড্রিনালিন রাশ হয়- তার সামনাসামনি হবার স্পর্ধা ,অড্রের নেই । এক ছেলে ছিলো, সে বাপের পাল্লায় পড়ে এইসব খেলায় মাতে আর একদিন প্রাণ হারায় । কাজেই অড্রে আর ওর কাছে ফিরতে চাননা । ঝড় ওর উপকারই করেছে । বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ।

আমি ওকে আশ্বাস দিয়ে বলি যে আমিও আর ঐ পাড়ায় ফিরছি না । আমার স্বামী ফিরে এলে প্রবাস থেকে, ওকে আমি এখানেই ডেকে নেবো । আর ও নীলকে চেনেও না ।

নীল নাকি স্ত্রী- হারিয়ে যাবার পর খুব কেঁদেছিলেন এটা শুনেও অড্রের মন গলেনা । বলে :: আরে ওগুলো হল কুমিরের অশ্রু ।

নীল চাঁদের আলোয়; সেদিন দেখেছিলাম এক নীলপরীকে । সে তার জাদুকাঠিটা লুকিয়ে রেখে- ভালোবাসে নীলাম্বরী হয়ে, নীল নীল জোছনায় ভেসে যেতেই ।

মাঙ্গলিক

আর্শি একজন মেয়ে, যার পূর্বপুরুষরা সবাই পরবাসী । বাঙালীত্ব না থাকলেও, ভারতের পরশ আজও আছে ওদের মনে । তাই মেয়েকে সম্বন্ধ করেই পাত্রস্থ করার সংকল্প করে ওর বাবা ও মা । কলেজে সবাই যখন ডেটিং-এ ব্যস্ত তখন সে লেখাপড়ায় মন দেয় । মুখে বলে যে লোন শোধ করতে হবে সরকারের । যা পড়ার জন্য নিয়েছে । তাই মনটা বিদ্যা অর্জনে ঢালছে । সেক্সে নয় । সেক্সটা ও বিয়ের পরেই করবে । ভারতের লোকেরা এরকমই । একে পিছিয়ে পড়া না বলে অন্য একটা ব্যবস্থা বলেও ভাবা যায় । মাল্টিপেল্ পার্টনার থাকলে অনেক অসুখ বিসুখও হয় ।

যাইহোক্, মেয়েটি বয়ফ্রেন্ড করার দিকে না গিয়ে ক্যারিয়ার নিয়ে লেগে পড়ে । সময়মতন একজন অ্যাকাউন্‌টেন্ট হয়ে, পাশ করে বার হয় । নিজের ট্যাক্স ফার্ম শুরু করে । ভালই চলছিলো । এবার বিয়ের পালা । ওর পরিবার ; ওকে লোকাল ভারতীয় কাগজে

অ্যাড দিতে বলে- বিয়ের । দেওয়াও হয় । কিন্তু ঠিকুজী বিচার করে দেখা যায় যে সে মাঙ্গলিক । কাজেই বিবাহিত জীবন বিষময় হবে ।

দুজন মাঙ্গলিকের বিয়ে হলে নাকি নেগেটিভ এফেক্ট কেটে যায় । কাজেই পুরোহিতের পরামর্শে ,ওর পরিবার, আরেক মাঙ্গলিক পাত্রের সন্ধানে লেগে পড়ে । কিন্তু বাস্তবে --আরেকটি প্রবসী, মাঙ্গলিক পাত্র পাওয়া মোটেই সহজ হয়না । ফলতঃ ওর বিয়ে দেওয়া হবে স্থির হয় ঈশরের সাথে অথবা শাস্ত্রমতে গাছের সাথে ।

হঠাৎ বুদ্ধি খেলে যায় আর্শির মগজে । ওর মনে হয় একবার ডেটিং সাইটে ট্রাই করা যেতে পারে । অনেক পাত্র থাকে যারা বিয়ে করতে চায় জীবনের শেষ ধাপে । তারা হয় অসুস্থ কিংবা বয়স্ক অথবা লং-টার্ম ব্যাচেলর, যাদের আয়ু ফুরাতে চলেছে ।

গাছ অথবা ঈশ্বরের সাথে সাত পাক না ঘুরে একজন মানুষ- যার এমন বাসনা আছে,তার গলায় মালা দেওয়াটাই বোধহয় বেশি প্রয়োজন ।

ডেটিং সাইটেই খুঁজে পায়, ৫০ বছরের জেফ্ কে ।

জেফের সমস্যা ছিলো- বৌয়ের জন্য স্বাধীনতা হারাবার ভয় । বিয়ে নাকি প্রিজন । তাই বিয়ে করেনি । কিন্তু

এক অজানা নার্ভের অসুখে, আজ শয্যাশায়ী হলেও মনে হয় মৃত্যুর আগে একটি বৌয়ের মুখ দেখে গেলে খুব ভালো হত । জীবন তো একটা বৈ নয় !! যারা ডেড্দের সাথে কথা বলতে পারে বলে দাবী করে- সেই সাইকিক্দের অত বিশ্বাস করেনা জেফ্ । তাই জীবন তার কাছে পজিটিভ মরণ । সবাই মৃত্যু ঘুমে আছে । স্ফুলিঙ্গ জ্বললেই তার নাম নাকি জীবন । আর সেটা জ্বলে একবারই ।

পরিবারের সাহায্য নিয়েই জেফকে বিয়ে করে আর্শি ।

বিয়ের দু-মাসের মধ্যেই তার মৃত্যু হয় । তবে মনোবাসনা পূর্ণ হয় । একজন বৌয়ের স্পর্শ নিয়েই মরে । শেষদিকে শয্যাশায়ী হয়ে ছিলো, নার্স ও চিকিৎসকের আড়ালে --তবুও বৌকে দিয়ে গেছে সমস্ত সম্পত্তি । নিজেকে ধনী মনে না করলেও তার প্রপার্টি বলতে ছিলো তিনখানা বাড়ি (একটি গ্রামে) আর দুটি সেকেন্ড হ্যান্ড মোটর গাড়ির দোকান !

মায়া

বীরিগাঈরি শহরে এক অফিসার আছে যার কাজ হল আইন বিরোধী কন্সট্রাকশান গুঁড়িয়ে দেওয়া । লোকটির নাম মাইকেল চুং ।

চীনা মানুষ । এসেছে চীন দেশের এক শহর থেকে । ভদ্রলোক খুব সিনসিয়ার ও সৎ । কাজ দিলে তা না শেষ হওয়া অবধি তার ঘুম আসেনা ।

চুং ; খুব দাপুটে অফিসার বলে- ওপরওয়ালা ওকে কন্ট্রোভার্শিয়াল সব সম্পত্তি গুঁড়িয়ে দেবার দায়িত্ব দেয় । যাতে ক্ষমতার জোরে ধনীরা, নিজেদের এই আইনের বাইরে না রাখতে পারে । সবারই তো নানান ফিল্ডে মামা, কাকা, জ্যাঠা থাকেই । তবে চুং-এর একটি সমস্যা আছে । সে ভারতের মানুষকে দুচোখে দেখতে পারেনা । ভারতের লোক শুনলেই নানানভাবে তাদের হেনস্তা করে ও ব্যাতিব্যস্ত করে তোলে । এমন কাগজ চায় যা হয়ত নেই বা ছিলোই না । এমন এমন পলিসির আন্ডারে ফেলে দেয়- যা থেকে মুক্তি পেতে গেলে কড়া ফিজ্ লাগে । কাজেই ভারতের মানুষ, যারা হিন্দী ও উর্দু পারে- তারা নিজেদের পাকিস্তানি বলে

আর যারা বাঙালী- তারা নিজেদের সোজা বাংলাদেশী বলে দেয় । শুনে খুশী হয় চুং । বলে :: ইয়েস ইয়েস আই নো , গ্রেট পোয়েট , নোবেল লরিয়েট অ্যান্ড ওয়ান অফ্ দা ফোর পিলার্স অফ্ ওয়ার্ল্ড লিটারেচার রবীন্দ্রনাথ টেগোর ওয়াজ আ বেঙ্গলি !

মায়ায় মোড়া, ছল করা ভারতীয়রা তবুও কেউ ভুলেও বলতে যায়না যে --ইয়েস হি ওয়াজ ; বাট নট ফ্রম বাংলাদেশ !!

শালুক

একটি দেশ ; তার নামটি খুব মিষ্টি । শালুক ।

সেই দেশের এক নেতা প্রায় ৪০ বছর কারাগারে বন্দী ছিলো । তার কারণ সেখানে মিলিটারি শাসন ছিলো তাই ডেমোক্রেসির দাবীতে ঐ নেতা জেলে কাটায়- তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান অধ্যায় ।

নেলসন্ ম্যান্ডেলা যার আদর্শ , তার জীবন- কালো ঘরে বন্দী অবস্থায় কাটলেও তার দু:খ নেই শুধু যদি দেশের মানুষ সমান সম্মান ও আদর পায় শাসকের কাছে আর সেনা শাসন বন্ধ হয় । সেনারা অনেক অত্যাচার করতো । বিশেষ করে সাধারণ মানুষের ওপরে । ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া । লুটপাট । ধর্ষণ ইত্যাদি । এই নেতা ঘনশ্যাম পূজারা, তার দেশের প্রায় নব্বই ভাগ সমর্থন নিয়ে ; পরে শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে । ততদিনে ডেমোক্রেসি এসে গেছে ।

ডিক্‌টেটরশিপ্‌ বা সেনা শাসন আর নেই । ওদের প্রধানকে, পথে বার করে কুপিয়ে মেরেছে জনগণ ! ম্যাস্‌ ক্ষেপে গেলে, হাজার সেনার চেয়েও ভয়ানক হয়ে ওঠে । **কাজেই সার্থক এতদিনের জেলবাস , ঘনশ্যামের ! খুব খুশী ;এই নেতাজী !**

কয়েকবছর পরের ঘটনা : : :

হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ্য, জৈন, খ্রীস্টান সবার ভোটে জয়ী হওয়া ও ডেমোক্রেসি ফিরিয়ে আনা এই মহান নেতা ,গদিতে বসেই দেশ থেকে সব মুসলিম, বৌদ্ধ্য , জৈন আর খ্রীস্টানকে তাড়াতে শুরু করে । তার মত হল : : এটা নেপালের মতন হিন্দু দেশ হবে । এতদিন ওরা এখানে ছিলো তাই ভোট দিয়েছে । এখন দেশের শাসক যা ভালো মনে করবে তাই করবে । আর আমি রাজা না ওরা ? কিসে শালুক দেশের মঙ্গল হবে আমি বেশি বুঝি নাকি ওরা ?

রাজবংশে না জন্মেও, রাজার মুকুট পরা এই নতুন দিনের নেতার যুক্তি শুনে পাগলও হেসে ফেলে । তবে বেশি হাসেনা । কারণ এই নব ডেমোক্রেসিতে হয়ত পাগলও ঠাঁই পাবেনা । **থাকবে কেবল রাজার প্রতিবিম্বের মতন ; কিছু আয়না মানুষ ।**

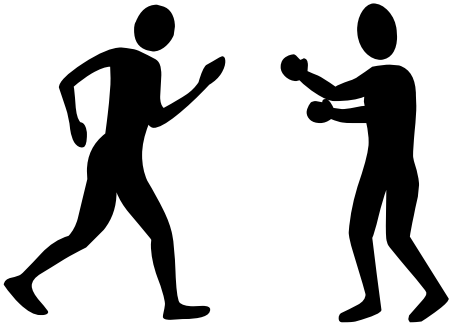

শত্রু

উত্তম সাহা, নিয়মিত আন্তর্জালে বসে বসে নামী অভিনেত্রীদের সিনেমার পাতায় একটি তারকা চিহ্ন দিতো । ওয়ান স্টার , টু স্টার দেওয়া নিয়ে পরেশ রাওয়াল বলেছেন যে ক্রিকেট শিখবো গাভাস্কারের কাছে । এইসব লোকের কাছে নয় যারা কিছু না বুঝে (মনে মনে-- বা বদমাইশি করে)এইসব স্টার দিচ্ছে ।

ঠিক এতটা কঠিন না হলেও এক অভিনেত্রী যে মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়ে , বাবা তার মেরিন বায়োলজিস্ট ও মা ব্যাঙ্ক অফিসার তার মূল্যবোধে বাধে বলে কিছু বলেনা এই এক-তারা নিয়ে । লোকটি বেছে বেছে এই নায়িকার ছবির সাথেই একতারা চিহ্ন দিতে অভ্যস্থ ছিলো । নায়িকার নাম কৈকসী চন্দ্রন । যখনই নতুন ছবি রিলিজ হতো তখনই এই ওয়ান স্টারের খেলা জমে উঠতো ।

লোকটি কেমন যেন জ্বলতো । হিংসা আর রাগে । তবে ঐ স্টার দেখে দেখেও, লোকে নায়িকাকে ত্যাগ করেনি কারণ বুদ্ধিমান মানুষ বুঝতো এ কোনো শয়তানের শয়তানি অথবা বালখিল্যপনা ।

উত্তমের আসল নাম দিব্যন্দু চ্যাটার্জ্জী । নাম ভাড়িয়ে স্টার পোস্ট করতো । কিসের এত হিংসা আর রাগ কেউ জানেনা । বিজ্ঞ সিনেমার লোকেরা, নায়িকাকে বলতো ওকে ইগনোর করতে । নায়িকার যে খুব মাথা ব্যাথা ছিলো সেরকম নয় তবে লোকটি কেমনতর মানুষ সেটা ভাবতো । নিয়ম করে বসে বসে কৈকসীর সিনেমার সাথেই একতারা চিহ্ন দেওয়া ! আরে লোকে তো বোরও হয় রে বাবা !

খবর নিয়ে দেখলো যে লোকটির এই নামে একটি ফেসবুক পেজও আছে । কাজেই বুঝলো যে সে পাবলিক লাইফে এই নাম ব্যবহার করতে অভ্যস্থ ।

বছর ঘুরে গেছে । উত্তম নিজ ভুবনে সক্রিয় । চাকরি আর একতারা বাজানো নিয়েই আছে ।

একদিন এই অভিনেত্রীর কাছে একটি মেসেজ আসে যে এক মোটর দূর্ঘটনায়, একটি শিশু জখম-- তার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা চাই ।

কন্যা সন্তানটি উত্তম সাহার বুঝলেও এই অভিনেত্রী কৈকসী চন্দ্রন তাকে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা দান করে । চিকিৎসার জন্য । লাজলজ্জা কিংবা আবেগ বলে মনে হয় উত্তমের কিছুই নেই । কারণ এরপরেও তার একতারা বাজতেই থাকে । **মুখে বলে :: এটা পার্সোনাল না , সিনেমার সমালোচনা আর ওটা চ্যারিটি করা হয়েছে ধান্দায় যাতে নাম ও যশ বাড়ে ।**

কাঁচের দেওয়াল

সুন্দরী পাল ; একজন রূপবতী কন্যা যার কাজ হল সরকারের দপ্তরে । যুবতী এই অফিসারটি খুব কম বয়সেই নিজেকে বলে কয়ে বদলি করায় সুন্দরবন এলাকায় । সেইসব অঞ্চলের মানুষের ভালো করার জন্য সে ওদিকে চলে যায় কলকাতার বাড়ি ছেড়ে ।

বাংলার পাল বংশের রাজাদের সাথে নাকি তার কী একটা যোগ আছে । নাম যার সুন্দরী তার কিন্তু কোনো বর নেই , ঘরও নেই ।

সুন্দরী , সুন্দরবনে কাজ করতে গিয়ে মানুষের চরম অবস্থা দেখে স্থির করে নিজেকে আর ভোগবিলাসে ডোবাবে না । কাজই হবে তার একমাত্র যজ্ঞ ।

মনে কোনো দু:খ ছিলো কিনা কে জানে তবে অনেক উপকার করেছে এলাকার দরিদ্র মানুষের ।

গ্রামবাসীরা মধু সংগ্রহ , মাছ ,কচ্ছপ ধরতে বনে ঢোকে । কিন্তু আইনতঃ তারা এসব করতে পারেনা তাই বাঘের পেটে গেলেও ওপরওয়ালার কাছ থেকে কোনো সাহায্য পায়না । এই ওপেন সিক্রেট নিয়ে সংস্থা না খুলে, সরকারি পদে বসেই ওদের সাহায্য করতো সুন্দরী ।

সমুদ্রতল উঠে আসছে । অনেক গ্রামীণ লোকের কুটির, আবাস্থল ভেসে গেছে নোনা ঢেউ এর প্রকোপে । অনেকের ভিটে-মাটি , যা কিনা শত বছরের পুরনো ; সেগুলিও আজ সমুদ্র গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে । তবুও নিজের মাটির বাড়ির স্পর্শ ও সবুজ ফসলের সুঘ্রাণ ছেড়ে কেউ অচেনায় পাড়ি দিতে চায়না । কোথায় যাবে ওরা ? পারবে সেখানে মানিয়ে নিতে ?

মূল ভূখন্ডে ওদের বাসস্থান করে দেয় সরকারি অফিসার সুন্দরী । তার নাম রেখেছিলো পিসিমা । হয়ত আঁচ করেছিলো যে সে একদিন এই অঞ্চলে এসে থাকবে । লোকে দুহাত তুলে ওকে আশীর্বাদ করেছে । সমুদ্রের সাথে কেউ যুদ্ধে জেতেনা -- এসব খবরের কাগজে অনেক বেরিয়েছে । অনেক লেখা হয়েছে এইসব নিয়ে ।কিন্তু যা করা সম্ভব তাই করে সে নিজের মান বাড়িয়েছে । অবশ্য লোকাল এক দাদার, চক্ষুশূল

হয়েছে যে স্মাগলার । ব্যাঘ্রচর্ম , কচ্ছপ এইসব চালান করে । টোটন দলুই । সংক্ষেপে টোটা ।

সুন্দরীর বর নেই , ঘরও ছিলোনা । এখন বিশ্ব দরবার ওর ঘর । কিন্তু বর একটিও জোটেনি ।

লোকে প্রশ্ন করলে বলেছে :: আমার আর পুরুষদের মাঝে একটি কাঁচের দেওয়াল থাকে তাই হয়ত কেউ আমাকে প্রপোজ করেনি । জীবন আমাকে যা দিয়েছে আমি তাতেই খুশী । আর এখন তো মধ্য চল্লিশ । এই বুড়ো বয়সে বিয়ে করা মানে সেক্সলেস্ ম্যারেজ । সেসব পথে পা দেবার আমার কোনো ইচ্ছেই নেই !

এরপর কয়েক বছর পার হয়ে গেছে । লেখক ; সংবাদ পায় যে সুন্দরী পালের নাকি শুভবিবাহ হয়েছে । বেশ মজা লাগে লেখকের । একটু খোঁজখবর নিতে বার হয় যে যার গলায় মালা দিয়েছে সে ঐ এলাকার কুখ্যাত স্মাগলার টোটন দলুই !!

সুন্দরবনে না গিয়ে আর পারেনা লেখক । শোনে যে টোটনকে বিয়ে না করলে, বেশিরভাগ যুদ্ধতেই জেতা সম্ভব নয় । বৌ হলে অনেক যুদ্ধ হয়না বা অন্যভাবে হয় কাজেই একপ্রকার বাধ্য হয়েই টোটনকে বিয়ে করেছে সুন্দরী । তাই এখন ঝামেলা হয়না ও বাধা

আসেনা- লোকাল, গ্রামের মানুষের ভালো করার সময় । আর সে তো বিয়ে করবে নাই ভেবেছিলো । কাজেই স্বামীর সোহাগ তার কাছে বোনাস । যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট । বলাবাহুল্য -টোটার নামের সাথে স্মাগলার তাক্‌মা লেগে গেলেও, চরিত্র তার একদম ফার্স্ট ক্লাস । কোনো কালো দাগ অতি বড় শত্রুও দিতে পারবে না । আর সত্যি কথা বলতে কি- চরিত্র তো খারাপ হয় বিয়ের পর , ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমেডি আছে না এই নিয়ে ? বিয়ে তো টোটনের একবারই হয়েছে , সুন্দরীর সাথে । প্রস্তাব পেয়ে অসম্ভব খুশী হয় টোটা । কারণ সুন্দরী ফাটাফাটি দেখতে । বয়সটা একটু বেশি আর কি । তাতে কী ? আজকাল তো কত কিছু বেরিয়ে গেছে , কত উন্নতি হচ্ছে । চারপাশে কত উন্নয়ন , পর্যটন , বিজ্ঞাপন !!! রঙীন স্বপ্নের আর মূহুর্তেরও ।

টোটার পয়সা আছে ; সে লোক লাগিয়ে বার করে নেবে সব । আর টাকায় কী না হয় ? ছোটলোক, ভদ্দরনোক হয়ে যায় আর এতো সামান্য কিছু মূহুর্তকে কালারে চোবানোর ব্যাপার ।

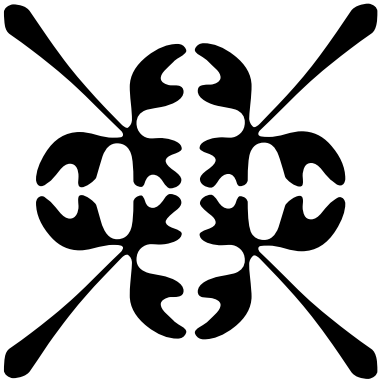

ধানসিড়ি

অসমে ; ধানসিড়ির মতন আরেকটি নদী আছে । সুবনসিড়ি । সেখানে নাকি আগে সোনার কুচি ভাসতো । স্থানীয় অনেক মানুষ ও রাজা-গজারা সেইসব সোনা, নদীগর্ভ থেকে তুলে নিয়ে গেছে । ইদানিং তবুও কিছু হয়তবা পাওয়া যায় ।

এই তথ্য বইয়ে পড়ে ইতিহাসের ছাত্রী তমালী একদিন সেখানে যাবার কথা ভাবে । এই নদীকে- স্বর্ণশ্রী বলেও ডাকে লোকে । বলা ভালো তমালী সোনাশ্রী বলে ।

বহু মানুষকে যুগ যুগ ধরে রুটি দিয়েছে এই নদী তাই আবেগে ভরে ওঠে তমালীর অন্তর ।

এই নদী চরায় আজ আর কোনো স্বর্ণ কুচি না পেলেও সেখানে এক ভদ্রমহিলার দেখা পেয়েছে তমালী যার নাম হেমাঙ্গিনী । শর্টে হেম । বা লোকে বলে হেম-মা ।

ওকে দেখে কেউ বাঙালী বলবে না । চেহারা তার চীনাদের মতন । হলুদ গায়ের রং । মহিলা , লোকাল

মহলে বেশ নামী । এই নদীর মহিমা নিয়ে বই লিখেছেন । অসমের সাহিত্যে হয়ত অনেক লেখা থাকবে এই অপরূপ নদী নিয়ে কিন্তু বাংলায় এত ডিটেলস্ নিয়ে হেমাঙ্গিনীই প্রথম লেখে ।

তমালী ; বাঙালী মেয়ে হলেও দেখতে চীনাদের মতন । ওর আর হেম-মায়ের মুখও ; একেবারে এক !

আসলে হেমই তার জন্মদাত্রী । খুব ছোটবয়সে , তমালীকে একা রেখে তার মা চলে যায় । অনেক পরে তাকে নাকি রাঁচির উন্মাদ আশ্রমে দেখে, অনেক মানুষ । বাকি জীবনটা সে পাগলা গারদে কাটাচ্ছে এইরকম সবাই ভেবেছিলো । বই কিন্তু লিখেছে অচলা দাসী এই ছদ্মনামে ।

মাকে না চেনার কারণ নেই । নাম হেমাঙ্গিনী আর দেখতেও একদম তমালীর মতন । অনেক ছবি তো দেখেছে । বুকে করে নিয়ে শুয়ে থাকতো মায়ের ছবি !

মা থাকা আর না থাকা একেবারে আলাদা জিনিস । যাদের মা মরে যায় অথবা ছেলেবেলায় হারিয়ে যায় তাদের কষ্ট কেউ বোঝেনা । মাম্মি , মা, মাঈ বলে ডাকার কেউ থাকেনা । সব অপরাধ ক্ষমা করে দেবার কেউ আর দুনিয়ায় থাকেনা তখন । মমতাময়ী , কোমল সেই কোলের স্পর্শে আর আসেনা ঘুম !

মায়ের হাতের রান্না আর গায়ের গন্ধ কোনোদিন পায়নি তমালী । তাই এখন এইভাবে মাকে পেয়ে তার কোলে ঢলে পড়ে । লুটিয়ে পড়ে তার দুই পায়ে ।

কিন্তু তার মা হেমাঙ্গিনী তাকে বিমুখ করে । ত্যাগ করে । বলে :: জেনেশুনেই তোমাকে আমি ফেলে চলে এসেছি । তোমার বাবার অত্যাচার আমি সহ্য করতে পারিনি । মারধোর , গায়ে তেল ঢেলে পুড়িয়ে দেবার মতলব-- এইসব কারণে আমি চলে আসি , এখানে । তার আগে অবশ্যই তোমার বাবার আচরণের জন্য আমাকে লুম্বিনি পার্কে কাটাতে হয় কিছুটা সময় । আর এখন আমি সব ভুলে নতুন করে বাঁচতে শুরু করেছি এমন সময় তুমি ঝড়ের মতন এসে আমাকে কেন আমার অতীতে নিয়ে যেতে চাইছো ?

এই প্রশ্নের কী জবাব দেবে ভেবে পায়না , তমালী ।

তাকে দেখলে, তার মায়ের নাকি তার বাবার কথা মনে পড়ে যায় । আর বহু পুরনো ক্ষত আবার জেগে ওঠে । কাজেই ওকে একপ্রকার তাড়িয়েই দেয় ওর মা । এই কঠোর ব্যবহারে একটুও বিচলিত হয়না তমালী ।

নিয়মিত অপেক্ষা করতে শুরু করে ; মায়ের বাসস্থানের বাইরে ।

তমালী সাজতে খুব ভালোবাসে । টেরাকোটার গয়না , ম্যাচিং পোশাক , কন্ট্রাস্ট কালারের টিপ, আর চোখা নাকে জ্বলন্ত হীরা । ভালোলাগে ওকে দেখে । সেজেগুজেই বসে থাকে মায়ের আঁচলের নিচে । যদিও এই আঁচলখানি উল্টোদিকে দেওয়া !

প্রায় ৬ মাস কেটে গেছে । মায়ের মতি ফেরেনি বলে সে নিজের বাসায় ফিরে যায় । কিছুদিন গ্যাপ দিলে হয়ত আবার ওখানে গিয়ে বসে, লাভ হলেও হতে পারে এইভেবে সে নিজ বাসায় ফিরে চলে ।

আত্মীয়স্বজন , বন্ধুরা সবাই জানতে চায় যে সে সোনার কুচি অথবা খনি পেয়েছে কিনা !

উজ্জ্বল মুখে, হাসি এনে বলে ওঠে তমালী , হয়ত মেটাল সোনা পাইনি তবে তার চেয়েও বেশি একটি জিনিস আমি পেয়েছি । ওখানে আমি আমার মাকে খুঁজে পেয়েছি । এখন শুধু ডাকের অপেক্ষা । ডাক এলেই, আমি রূপার ডালি নিয়ে সোজা সুবনসিড়ির পাড়ে যাবো । সোনা , হীরা, মণি-মাণিক্য সবকিছু তুলে আনতে । আর ফেরার পথে ধানসিড়ি নদীতেও ভাসবো ! বিখ্যাত কবির অনুভূতিটি বোঝার চেষ্টা

করবো । আবার আসিবো ফিরে , ধানসিড়িটির তীরে - ----------এই লাইনটি কেন লিখেছিলেন উনি ,

নিজে গিয়ে খতিয়ে দেখবো ।

এমন যুগ পড়েছে -যেখানে মা ও সন্তানের মধ্যে কেউ না কেউ চলে আসছে সেখানে একজন কবির লেখা একটি বাক্য বা কবিতার লাইন বিশ্বাস করার জন্যও বুকের পাটা লাগে বৈকি !!!

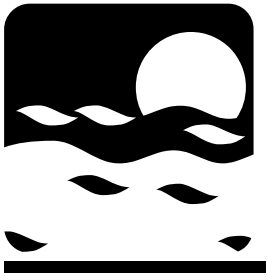

শতভিষা

শতভিষা আজকাল খুব বক্তৃতা দেয় । স্পিকার । নানান বিষয় নিয়ে লোককে জ্ঞান দান করাই ওর কাজ । বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এই মেয়েটি পতির পদমর্যাদার কারণে অনেক সুযোগ পেয়েছে । পতিদেব একজন সরকারি কমিশনার । কাজেই অনেক রকম কাজ করতে, অভ্যস্থ হয়ে যায় শতভিষা ।

তার পতিদেব দীপন নিজের স্ত্রীর জন্য গর্বিত । নানা মেয়েদের সমস্যা ও সামাজিক ইস্যু নিয়ে গলা ফাটিয়ে ডোনেশান যোগাড় করা ও মানুষকে সচেতন করার কাজ বেশ ভালোভাবেই করছে শতভিষা । সত্যি, সে যেন আজ দীপনের আকাশে শুধু নয় বাংলার আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র !শতভিষার ইংলিশ পোক্ত নয় । তাই নিয়ে তার কোনো লজ্জা নেই কারণ এটি তার মাতৃভাষা নয় । বিদেশী একটি ভাষা ।

মুখর শতভিষা , তুখোড় - নিজ ভাষাতেই । ভালো কথা বলতে পারা ও গুছিয়ে বলতে পারা তাও নানান জটিল ইস্যু নিয়ে খুব একটা সোজা জিনিস নয় ।

আজকাল অনেক টিভি চ্যানেলেও বলছে সে । আর অনেক ডোনেশান যোগাড় করেছে । পতির সাহায্য ছাড়াই ! পতির পদ হয়ত আগে কিছু সাহায্য করেছে । পরে নিজের যোগ্যতায় এগিয়েছে ।

এহেন শতভিষার- কতগুলো নগ্ন ছবি বা ফটো , ফেসবুকে আপলোড করেছে এক আলোকচিত্রী । সে নাকি তার প্রেমিক ছিলো । শতভিষাকে, যুবতী রূপে দেখা যাচ্ছে । অত্যন্ত কম পোশাকে সজ্জিতা । সোজা বাংলায় বিকিনি তাও অতি খাটো ; পরিহিতা । দু একটি বুঝি নগ্ন ছবিও আছে ।

অনেকে মত দেয় যে মেয়েদের ছোট করার যেই তিনখানি অস্ত্র পুরুষের হাতে আছে, নগ্ন ছবি, বেশ্যা টাইটেল আর জারজের মা--- তার মধ্যে প্রথমটি ব্যবহৃত হচ্ছে । হয়ত ওর স্বামীই করাচ্ছে বকলমে ।

শতভিষা কিন্তু আশ্চর্যভাবে নীরব । কোনো কথাই বলেনি । কারণ লোকটি ওর বয়ফ্রেন্ড ছিলো- আর ফটোগুলিও সত্য । দীঘার সমুদ্রের ধারে, বিয়ের আগে

মৈথুন ও স্বল্পবসনা শতভিষাকে মডেল করে নানান পোজে ফটো তোলা হয়েছিলো ।

তবুও তার বুক কাঁপেনি । পতিদেব হয়ত ডাইভোর্স চাইবে, এই কথা ভেবেও একবিন্দুও ঘাবড়ায়নি ।

সত্য হল গরল । একদিন না একদিন বেরিয়ে আসবেই । তাই সে চুপ করেই থাকে ।

তার স্বামীও ওগুলি দেখেছে । কিন্তু ক্ষমা করে দেয় স্ত্রীকে । অদ্ভুত ম্যাচিওরিটি দেখায় ভদ্রলোক !

কমিশনার বলে কথা !

আসলে পতিদেবের যুক্তি হল এই যে , যৌবনে অনেকেরই পদস্খলন হয় । কিন্তু এখন তো শুধরে গেছে ! স্বামী হয়ে নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনো ঠকাবার অভিযোগ নেই দীপনের । সংসারধর্ম পালনে কখনো কোনো গাফিলতি দেখা যায়নি । আর লোকের জন্যেও করছে । তাহলে কতগুলো নষ্ট ছবি , তাও অপরিচিত এক মানুষের কাছ থেকে আসা- কেন নষ্ট করবে ওদের দাম্পত্য শান্তি ? ওদের সাংসারিক জীবনে কি কোনো সত্য ও শক্তি নেই যে সামান্য কতগুলো পুরনো ছবি দিয়ে ওদের ঘরে ভেঙে দেওয়া যাবে ?

ব্ল্যাকমেলার-- যে কিনা নিজেকে , শতভিষার বয়ফ্রেন্ড বলে পরিচয় দিয়েছে সে আসলে কাপুরুষ । তাই সুযোগ পেয়ে- মহাপুরুষ হবার ফাঁদে পা দিয়ে এগুলি করছে । কিন্তু চাইলেই তো আর মহামানব হওয়া যায়না ! গোড়াতেই তো মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে !! **শতভিষা আর দীপনের সাজানো সংসারকে সে তাসের ঘর ভেবে বসেছে ।**

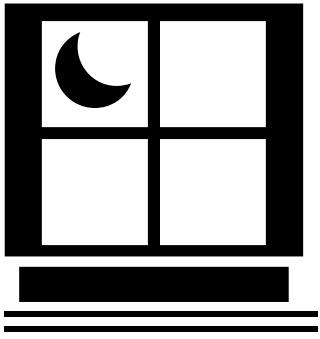

অহনা

অহনার নামটা শুনলে কেউ বলবে না যে সে অফিসের ক্যান্টিনে কাজ করে । কেমন মধুময় না নামটি ?

অহনার স্বামী শতদল চ্যাটার্জ্জি ; এক হাড়বজ্জাত মানুষ । সে করতো ক্লার্কের কাজ আর পরে বড়বাবুও হয় কিন্তু অনেক মানুষের চাকরি খেয়েছে , অনেককে পলিটিক্স করে নিচু পদে রেখেছে ইত্যাদি । জটিলতা ও নোংরামো এবং ঘোরপ্যাঁচ দেওয়া কাকে বলে ওর কাছে শিখতে হয় ।

লোকটির চেহারায় একটা চটক আছে । খুবই ফর্সা , চোখ- নাক -মুখ ধারালো । একটু মোটার দিকে ।

টেবিল ফ্যানের সামনে, একটি ফুল প্যান্টকে খুলে ধরলে যখন সেটা ফুলে ওঠে, তখন তাকে যেমন লাগে তাকে ওর ক্রিটিকরা --শতদলের প্যান্ট বলে হাসি মস্করা করতো ।

অহনাকেও সে ফাঁসিয়ে বিয়ে করে । অহনা বলেছিলো যে গলায় দড়ি দেবো তবু ঐ শতদলকে বিয়ে করবো না । তবুও ওকে প্ল্যান করে ফাঁসিয়ে বিয়ে করে ।

অহনা খুব একটা খুশী ছিলোনা । সবসময় শতদলের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ করতো । ওর একটাই ছেলে । তাকে রামকৃষ্ণ মিশনে রেখে বড় করেছে । ছেলেটি যাতে বাবার থেকে দূরে মানুষ হয় আর বদ গুণগুলো না পায় ।

ছেলে খুবই ভালো মানুষ হয়েছে । কম্পিউটার পড়ে আজ ডেনমার্ক তো কাল জাপান তো পরশু জার্মানি যাচ্ছে । একজন ক্লার্ক ও ক্যান্টিনের সেলস-ওম্যানের পুত্র, অনেক এগিয়ে গেছে দেখে ভালোলাগে ।

অনেকদিন পরে -অহনার সাথে দেখা হলে শুনি যে শতদল, বড়বাবু হয়ে অবসর নিয়েছে । অথচ ওর সিটে বসার আরো তিনজন যোগ্য লোক ছিলো যাদের সে নোংরামো করে , ভয় দেখিয়ে বড়বাবু হওয়া থেকে আটকেছে ।

আমি জানতে পারলাম যে শতদল এখন রিল্যাক্স না করে মিষ্টির দোকান খুলেছে । হতে পারে । পয়সার

সবারই দরকার । কিন্তু মিষ্টি বানানো শিখলো কোথায় আর কখন ?

সব শুনে অহনা বলে ওঠে যে শতদল কেবল জিলিপি ভাজে । সকালে ও বিকেলে । আর কোনো মিষ্টি নিয়ে কাজ করেনা । রাস্তায় মোড়ে বসে জিলিপি ভাজে ।

আর ওকে কিছুই শিখতে হয়নি । ওর মনে কোনো সরলতা নেই । এতো জঘন্য প্যাঁচ যে ও জিলিপি ভাজার সময় একবার তাকালেই আশ্চর্য সমস্ত প্যাঁচ নিজের থেকে হয়ে যায় । অমৃতির মতন মোটা নয় আবার জিলিপির থেকেও বেশি রসালো প্যাঁচ দেখে অন্যান্য দোকানিরাও অবাক হয় । বিনা ট্রেনিং এ এমন আজব জিলিপি ভাজা হচ্ছে বলে ।

ভালো আমদানি হচ্ছে তাই শতদল এখন ছুটির দিন বাতিল করে দিয়েছে । বুধবার অফ্ নিতো দোকানে । বাসায় থাকতো । এখন বুধবারও জিলিপি ভাজে । সকাল সন্ধ্যায় । আর একটি লোকও পুষেছে যে জিলিপির ব্যাটারটা বানিয়ে দেয় । মোটা ও পুরু ব্যাটারের দিকে অহনা-পতি চাইলেই সেটা অসাধারণ জিলিপি হয়ে ওঠে । নির্ভেজাল বাঙালী ধাঁচের ।

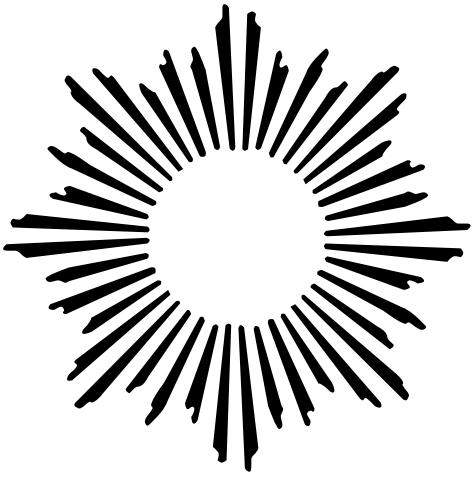

শিবম

শিবম মেনন-কে দেখি দক্ষিণ ভারতের গ্রাম ছেলগম্ -এ । আমি ছিলাম লোকাল বাজারের এক দোকানি ।

মেয়ে হলেও --আমার বাবার মৃত্যুর পর আমি এখানে দোকান চালাতাম । আমার ক্ষুদ্র ব্যবসায় একজন বৃদ্ধ মানুষ প্রায়ই আসতো । আমি বইয়ের দোকান চালাতাম । ভদ্রলোক অনেক বই কিনে নিয়ে যেতো । পয়সা কখনো কখনো বাকি রাখতো ।

লোকটি, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ । পরণে মলিন ধুতি আর ফতুয়া । একা থাকে তাই রোজ আসতে পারেনা । বই দেখলে নাকি খুব আনন্দ হয় ।

একদিন আমি ; এক ক্রেতাকে বলি এই লোকটির কথা । ট্রাইবাল গ্রামের শিবম । কেমন বুড়ো বয়সে লেখাপড়া শিখে নিয়েছে । আর বই পড়ে রোজ । আমার কথা শুনে খুব হাসলো সেই ক্রেতা । বললো : :

তুমি বই ভালো বোঝো কিন্তু মানুষ নয় । এই লোকটি শহুরে লোক । অনেক বছর আগে- আদিবাসীদের মাঝে আসে, ওদের ভাষা :: পোখুরা নিয়ে গবেষণা করতে । তা প্রায় ৪০বছর ওদের সাথেই আছে তাই ওদের মতন হয়ে গেছে । ওর পুরো নাম ; করণ কুরুণাকরণ । লোকে শিবম বলেই ডাকে এখন । ওর স্ত্রী একজন আদিবাসী মহিলা । তার নাম পান্নু । ছেলে আছে একটা । শহরে থাকে । সরকারের ট্রাইবাল দপ্তরে কাজ করে । আদিবাসীদের জমি কেড়ে নেওয়া অপরাধ । সেসব দেখাশোনা করে ।

পরে, আমি শিবমকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে ওর পূর্বজ কেউ- এই ট্রাইবাল এলাকায় প্রথম আসে ১৮৫২ সালে । পরে ওর বাবা আসে- কিন্তু শহরে ফিরে যায় । বাবা কলেজে পড়াতো ।

শিবম বা করণ করুণাকরণ ; এই জনজাতির প্রেমে পড়ে যায় । ওদের ভাষায় দক্ষ হয়ে আর ফেরেনি, আধুনিক লোকালয়ে । বিদেশেও নাকি ছিলো ।

১৯৯৫সালে ইংল্যান্ডে ছিলো । গবেষণার কাজে । সেখানে ওর বিশ্ববিদ্যালয়ে, সবার এক একটা নিজস্ব কম্পিউটার ছিলো । কাজের জন্য । আর সে একজন

রোডস্ স্কলার । অর্থাৎ লেখাপড়ার বাইরেও ; কাজে দক্ষ। দেখে যদিও মনে হয়না সেসব । মনে হবে, নিতান্তই এক সাদামাটা জংলী মানুষ- যার কথা বলার ধরণও হয়ত ইচ্ছে করেই আদিবাসীদের মতন ; যাতে সহজে কেউ বুঝতে না পারে ! একে বিনয় না অভিনয় বলবে নিজে ভেবে বার করো ।

রম্ভা

রম্ভা কিন্তু নর্তকী না, দেবদাসী নয় সে একজন ব্রিলিয়্যান্ট মিস্ট্রি রাইটার । গুণীজন বলে :: **সি ইজ অ্যামং ওয়ান অফ্ দা বেস্ট রাইটার্স, অফ্ হার টাইম** । আমার ব্যাচমেট আর কি !! আমি জীবনে কোনোদিন আর্টস্ পড়িনি । বিজ্ঞান ও পরে কস্টিং । ও আমার সাথে ছবি আঁকা শিখতো । পরে, এক জার্মান সাহেবকে বিয়ে করে যে পুণাতে বসবাস করতো ।

রম্ভা লিখতে ভীষণ ভালোবাসতো । লিখতে বসলে জগৎ সংসার , সন্তান সবার কথা ভুলে যেতো ।

সেই রম্ভার সাথে বহুদিন পড়ে দেখা এক কাফেতে । কি করিস্ ? জানতে চাওয়ায় শুনলাম কোনো এক দেশে ; রাজার সিক্রেট এজেন্সিতে নাকি কাজ করে । আমি তো অবাক ! একজন আর্টিস্ট , গোয়েন্দা বিভাগে কী করছে ? ভাবলাম যে হয়ত পুলিশের হয়ে

ছবি টবি আঁকে । আঁকার হাত তো দূর্ধর্ষ ছিলো এবং আছেও । তবুও জানতে চাইলাম ।

সে সপ্রতিভ-ভাবে যা বললো তা শুনলে অন্যরাও অবাক হবে । সে নাকি -রাজার গোয়েন্দা বিভাগে, গল্প লেখে । ভাবলাম নির্ঘাত ওদের ম্যাগাজিনে । কিন্তু না, সে যেই গল্প লেখে, তার ওপরে ভিত্তি করেই দেশের মঙ্গলার্থে-- কোনো রাণী , রাজবধূ কিংবা নেহাৎ-ই কোনো বিদ্রহীকে সিক্রেট সংস্থা মেরে ফেলে ; ওর গল্পের প্লট অনুসারে । নির্ভুল প্লট তাই সবাই ওকে দূর্ঘটনাই ভাবে । খুন নয় । কেবল বিষয়টা দিয়ে দেয় রাজা আর শেষে কোনো অনুসন্ধান হয়না । হলেও সেই দূর্ঘটনায় গিয়ে মেলে ।

এই ক্ষুদ্র দ্বীপের রাজা, অসম্ভব কূট আর ক্রুরলোচন । জনগণের নিদারুণ অবস্থা আর এই ডিক্টেটর নিজের শাসন চালিয়ে যাচ্ছে নিজের মতন করে । সে নাকি অনেক আত্মীয় ও কাজিনদের মেরে ফেলেছে যারা গদির অংশ হতে পারতো কোনোভাবে ।

এই ভয়াল দেশে আমার বন্ধু কী সুস্থ আছে ? জানতে আমি উৎসুক । সে বলে ওঠে যে সে প্রচুর মাইনে পায় ও সুবিধে ।খাওয়াপরার কোনোই চিন্তা নেই সারাজীবনে । আর সে ওদের কোনো ব্যাপারে জড়ায় না । প্লাস্টিকের মতন থাকে । মেশেও না , গলেও না

।ওকে কেউ ঘাটায় না বেশি । আর ও ; নিজের মতন সারাটা দিন ছবি এঁকে কাটায় । যা সারাজীবন ধরে করতে চেয়েছে । স্টুডিও আর বাড়ি ; আর মাঝেমাঝে ফরমাইশি গল্প লেখা-- এই হল রম্ভার বর্তমান জীবনের জলছবি ।

রাইকিশোরী

জানুয়ারি মাসেও কলকাতার অসম্ভব গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত রাইমার । বয়স প্রায় পঁচিশের কাছাকাছি , এলোচুল , টিকলো নাক অনেকটা মৃতা অভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরীর মতন দেখতে । সুন্দরী বলে একটু দেমাকও রয়েছে ওর । মেয়েটি অন্তর্মুখী । তাই দিনের অনেকটা সময়ই কাটায় নেটে বসে । বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা নেহাত-ই মন্দ নয় । সবাই ভার্চুয়াল বন্ধু । কেউ কেউ লুক্কায়িত , শুধু বৈদ্যুতিক তরঙ্গে জীবন্ত । কেউ কেউ বাস্তবে নেমে আসে । তেমনই এক বন্ধু সজল পান । নামটাই প্রথম আকর্ষণ করে রাইমাকে ।

রাইমার নাম ত্রিপুরার নদীর নামে । রাইমা আর সাইমা নদীযুগল ত্রিপুরার চিরসাথী । তার বাবা ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের সার্ভেয়ার । জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে ঐ রাজ্যে । পরে কলকাতার বেহালায় এসে বাড়ি কিনেছেন । এখন ওরা ওখানেই বসবাস করে ।

সজলের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওরা দুজনে এক স্বর্ণালী সন্ধ্যায় বেড়াতে গেলো ভূটানঘাট । ডুয়ার্সের এই এলাকা বড়ই মনোরম । আগে থেকে বুক করা বনবাংলোতে এসে উঠলো দুজনে । এই প্রথম দেখা তো ! খুব সেজে এসেছিলো রাইমা ।

এমনিতেই সুন্দরী , চটকদার তার ওপরে সাজসজ্জা করে একেবারে রাজকুমারীটি ।

কিন্তু মিলন সমুদ্রের ঢেউ মনে এক আলোড়ন তোলে । যার কোনো সীমারেখা নেই । জ্বালা , তীব্র বিষের জ্বালা ! সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে খানখান ! দহন , দহনে টালমাটাল স্বপ্নের ভূটানঘাট ।

রাইমার রাজপুরুষ এক বৃদ্ধ । বয়স আন্দাজ ৫৫ । নাতিদীর্ঘ , থলথলে ভাব চেহারায় । দেখে মনেই হয়না ইনি লিখতে পারেন এত সুন্দর সুন্দর ই-চিঠি !

ভেঙে পরে রাইমা । মনের কষ্ট মনেই চেপে রাখে । সপ্তাহ-খানেক পরেও বাড়ি না ফেরায় পুলিশে খবর যায় । তদন্তে জানা যায় ভূটানঘাটের এক বনবাংলোয় তাকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে । পোড়ানোর আগে ছোট ছোট পিস করে ফেলা হয়েছিলো ।

বনবাংলোর ম্যানেজার জানান যে ঘটনার পরদিন রাতে এক বৃদ্ধ পর্যটক ,হঠাৎ তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বনবাংলোর বাগানে পার্টি দেন । সেখানে মদের ফোয়ারার সঙ্গে সঙ্গে আনলিমিটেড্ কাবাবের আয়োজন ছিল । এত কাবাব উনি কোথায় পেলেন কেউ জানেনা । অর্ডার দিয়ে বাইরে থেকে আনিয়ে ছিলেন ভেবেছিলো সবাই ।

আর কাবাবের স্বাদ ছিলো অদ্ভূত সুন্দর । শোনা যায় নরমাংস খুবই সুস্বাদু ।

ঝরা পাতা

আমি সুদূরের পিয়াসী । স্বেচ্ছায় হইনি হয়েছি বুকের ভেতরে এক জ্বালায় । আমি ছিলাম বাবা মায়ের এক মেয়ে , ঘোর কৃষ্ণবর্ণ , ঘোলাটে চোখ । তাই ছিলাম অনাদরের বড় অনাদরের । সকালের রোদ যেমন দাঁতহীন সেরকমই আমিও ছিলাম নিস্তেজ , বিবর্ণ ।

ছিল একটি সুন্দর সতেজ মন আমার । তাই নিয়েই বেঁচে ছিলাম আমি , ঐ কুৎসিত পরিবেশে । বাবা মায়ের বকা ঝকা , গালিগালাজ আমাকে কষ্ট দিলেও চুপ করে সব সইতাম । মনে মনে ভাবতাম একদিন হয়ত আমি ভালো চাকরি নিয়ে সুদূরে চলে যাবো আর এখানে আসবো না । আমার ভাইও খুব কালো কিন্তু ওকে বাবা মা কিছু বলতেন না ।

আমার যা রেজাল্ট তাতে করে আমাকে মেধাবী বলবেন সবাই । তাই হয়ত একদিন চড়ে বসলাম বিমানে । চললাম সব পেয়েছির দেশ আমেরিকায় , গবেষণার কাজে ।

আমার বিষয় জ্যোতির্বিজ্ঞান । গ্রহ নক্ষত্র আমাকে শান্তি দিতো । তারায় তারায় ঘুরে বেড়াতাম মাটিতে নামতে চাইতাম না । তাই বিদ্যার বিষয় বেছে নিলাম ঐ সাবজেক্টকে । গো প্লাস এষণা অর্থাৎ গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে চলতো লেখালেখি । ভালো ভালো কবিতা ও গল্প লেখার চেষ্টায় জড়িয়ে পড়লাম অনেক ওয়েব পত্রিকার সাথে , লেখা দিতাম ছাপা হত কিংবা হতনা । কিছু একটা হত । অনেকে ভূয়সী প্রশংসা করতেন তাতে অন্যের হিংসা বাড়তো । এইভাবে আমি এগিয়ে চলতে লাগলাম । একদিন আমার বই বার হল একটি ওয়েবসাইট থেকে ।

খুব ভালো লাগলো । নিজে জড়িয়ে পড়লাম একটি অ্যাফ্রিকান ছেলে ভিভিয়ানের সাথে ।

ভিভিয়ান আমাকে খুব ভালোবাসতো । ওর আগের স্ত্রী লোর্ণা ওকে ছেড়ে চলে যায়নি , মারা গিয়েছিলো । ভিভিয়ান তারপর থেকে একলা । ভারি একলা ।

আমরা মিললাম সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে । প্রথমে ওকে আমার খুব অহংকারী মনে হলেও পরে জানলাম বেশ ভালোমানুষ । আসলে নেটে তো মানুষ চেনা সহজ নয় !

এইভাবে আমরা বিয়ে করলাম । কিন্তু ভিভিয়ানও ধাপ্পা । ভীষণ ধাপ্পা ।

আমাকে চরম অপমান করতো । আসলে ও কোনো কাজই করেনা । খালি মদ খায় আর ড্রাগ্স নেয় । আমাকে কাজ করে ঘর দুয়ার সামলে চলতে হত তারপরে ওর মুড অফ হলে মারধোর দিতো আমাকে । আমার টাকায় খেলেও আমার কোনো স্বাধীনতা ছিলনা । এইভাবে আমি মুষড়ে পড়লাম । যেই বাড়িকে চিরতরে ছেড়ে এসেছিলাম সুদূর পরবাসে সেই বাড়িকেই আঁকড়ে ধরলাম । ভাই এলো বিদেশে । আমরা একসঙ্গে থাকতে লাগলাম । মায়ের সাথে ফোনে কথা হত । মনের বরফ গলে জল ।

দূরত্ব মনে হয় নিকটত্ব বাড়ায় । আর ছিলো চ্যাট রুম । তাতেই খুঁজে নিতাম আনন্দ ।

আবার পেলাম নতুন মানুষ তবে চ্যাটে নয় , পথে । যেতে যেতে বাসে । বেড়াতে বেশ ভালো লাগতো । একা একা চলে যেতাম নানান জায়গায় সেরকমই এক জায়গায় দেখা পেলাম সুব্রতর । সুব্রত খুব ভালো মানুষ । খাঁটি সোনা যাকে বলে । আবার ডুব দিলাম প্রেম অরণ্যে । আবার বিয়ে । এবার পাকাপাকিভাবে চলে এলাম দেশে , কেরালায় ।

সুব্রত বাঙালী হলেও অনেককাল কেরালায় ছিলো । ওর বাবা ছিলেন ওখানের ফিশারিজে ।

আমাদের একটি মেয়ে হল । নাম দিলাম আদিরা । আদিরা খুবই স্মার্ট মেয়ে ।

কালো হলেও একটা চটক আছে চেহারায় । দক্ষিণীরা দেখলাম কালো নিয়ে বেশ ভালো পরিমানেই হাসাহাসি করে । যেন মেঘ বেশি কালো না ভ্রমর !

আমার মেয়ে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হল । মন হল উদার , বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় গড়ে উঠলো চরিত্র ।

দৃঢ় , ঋজু । কিন্তু নদীর ওপাড় কহে ছাড়িয়া নি:শ্বাস !

হ্যাঁ এই বিয়েও সুখের হয়নি । একদিন ভ্রমণ করতে গিয়েই সব তচনচ হয়ে গেলো ।

আমরা গিয়েছিলাম সি -বিচে । সেখানে অর্ধ নগ্ন মহিলা দেখে দেখে আমার তৎকালীন স্বামী সুব্রত যেন কেমন হয়ে ওঠে ! চরম বেপরোয়া ও ইরেস্পন্সিবেল ।

একটি রোদপোয়ানো মেয়েকে ও ধর্ষণ করে ফেলে । তাতেই বিপত্তি । আবার আমি একা । আমি ওকে ক্ষমা করে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু সুযোগ দেয়নি । আমার ওড়না দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে ও হোটেলের ঘরে আত্মহত্যা করে । আদিরা আর আমি একদম একা হয়ে গেলাম ।

এইসব দেখে শুনে আদিরা বিয়ে করতে রাজি নয় । **ও সারাজীবন একা থাকতে চায় । ভয় পায় বিয়ে কে , কমিটমেন্টকে নয় , ভয় পায় বেড়াতে ।**

ঐ ঘটনার পরে আমরা দুজন আর কোথ্থাও বেড়াতে যাইনি । ছুটির দিনে আমরা ঘরে বসে লুডো খেলি কিংবা সুডোকু করি । একঘেয়ে লাগলে ওয়েবসাইট খুলে ভ্রমণ কাহিনী পড়ি । কিন্তু কোথ্থাও আর যাইনি । **মনে পড়ে যায় নির্মম ও ব্রতচ্যুত সুব্রতকে ,**

আমার , আমাদের মেয়ে , আমাদের আদর -আদিরার ।

††††††††††††††††††††††

the end